Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

DURGA TRADING CO.

40, Strand Road, Fourth Floor, Room No.4,

Kolkata - 700 001

Phone : 2243 1722 / 1447, Fax No. 033 2243 3922

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Leading Raw Meterial Supplier to Paper Mills :

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips and other Raw Materials for Paper Mills.

Pan No. AACHA0716 M

রহস্য উপন্যাস

অবেক্ষণ

শেখর সেনগুপ্ত

দীপ পাণিগ্রাহীর হাতের তালুতে আঁকা কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকার ভূগোল, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের ধরন-ধারণ। সে এখানে যেমন ধীর পদক্ষেপে চলতে পারে, তেমনি প্রয়োজনে হন্তদন্ত হয়ে একরকম উড়ানও দিতে পারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। শুদ্ধ কথ্য বাংলা তো বটেই, কিছু গ্রামাঞ্চলিক বচনেও সে অপরিচিতকে পরিচিত করতে, ভাবনাকে ভাগ করে নিতে সক্ষম। আবার সুযোগ পেলে রকে বসে গেঁজাতে আজও ওস্তাদ।

কারণ একটাই— তার বাল্য ও যৌবনের একাংশ বৃহত্তর কলকাতার রাজারহাট লাগোয়া নারায়ণপুর শহরতলিতে অতিবাহিত হয়েছে। বাবা অঘোরনাথ পাণিগ্রাহী ছিলেন সরকারি চাকুরে— নারায়ণপুরের সাব পোস্টমাস্টার। নীতিনিষ্ঠ মানুষ, কমবয়সিদের প্রেম-কেলির নামে বেলেল্লাপনা একদম সহ্য করতে পারতেন না। তাই দীপের বড় বোন সুজাতা যখন এক দলিত যুবকের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেয়, প্রৌঢ় অঘোরনাথ তা নিয়ে অনেক টানাহ্যাঁচড়া করেছেন। পরে অবশ্য প্রমাণিত হল যে, তাঁর আচরণ ও অভিব্যক্তিতে ছিল কিছু কপট অভিমানও। দলিত জামাতাকে তিনি কম আশীর্বাদ করেননি। এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলেছিলেন, 'হোক না দলিত, জামাই আমাদের উচ্চশিক্ষিত। তার চেয়েও বড় কথা, খাঁটি হিন্দু পরিবারের ছেলে। সুজাতার মাও এটাই বলে থাকে।'

অঘোরনাথের বাসনা ছিল, কলকাতার উপকণ্ঠে একটি ভদ্রাসন নির্মাণ করবেন। কিন্তু তাঁর সেই সাধ অপূর্ণ থেকে যায় তিনটি কারণে— প্রথমত, চিরদিন সততার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ায় ও ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচে কার্পণ্য না থাকায় অর্থাভাব ছিল জীবনের শেষ দিন অবধি। দ্বিতীয়ত, এরাজ্যের রাজনীতি ও প্রশাসনে নিত্য এমন সমস্ত হটব্রেকিং নিউজ তৈরি হয় যে, ছা-পোষা রাজনীতি-নিরপেক্ষ নাগরিকরা তেমন সামলে সুমলে নিজেদের দিনকাল কাটাতে পারবেন বলে মনে ভরসা পান না। তৃতীয়ত, চাকরি থেকে অবসর নেবার দেড় বছরের মধ্যে প্রথমে অঘোরনাথ, পরে তাঁর স্ত্রীও ইহকাল ত্যাগ করেন। নিষ্ঠা ও সততার ধকল সকলে ঠিক সমানভাবে সামলাতে পারেন না। হাকডাক নড়াচড়া করতে করতেই পরমায়ু শেষ।

স্বভাবতই দীপ পাণিগ্রাহীর পড়াশোনা কলকাতাতে। খুব মেধাবী না হলেও পরিশ্রমী। মুখস্ত করবার ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। বইপত্তর নিয়ে অপরিসীম ব্যস্ততা হেতু স্যাঙাতদের সংখ্যা কম। এর পুরস্কারও সে পেয়েছে। অর্থনীতিতে অনার্স এবং এম-এ দুটোতেই প্রথমশ্রেণী। তারপর যেদিন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার হয়ে ঢোকে, সেদিন একটু উগ্র মেজাজের দীপও আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফরাসি পারফিউম গায়ে ঢেলে ভুবনেশ্বরের ইতিউতি ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে ভুবনেশ্বরে কেন— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আরও কিছু বৃত্তান্তকে টেনে আনতে হয়। ঘটনাটা হল এই যে, প্রথমে বাবা, পরে মা ভিন্ন ভুবনে প্রস্থান করবার পর দীপ নারায়ণপুর ত্যাগ করে এবং তার বংশগত শিকড়ের খোঁজ করতে করতে চলে যায় ওড়িশার ঢেঙ্কানালে, — যেখানে একটা বহু পুরনো নিবাসে তার কাকারা, কাকিরা, খুড়তুতো ভাইবোনেরা এক হরিঘোষের গোয়াল বানিয়ে রেখেছে। সেখান থেকেই ব্যাঙ্কের ভুবনেশ্বর সার্কেলের ক্যান্ডিডেট হিসেবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং বাজিমাত করে।

নয় নয় করে প্রায় দু'যুগ আগের কথা। খুব শিগগির দিনগুলি অতীত হয়ে গেল। চাকরির শর্তানুযায়ী প্রথম দু-বছর সারা ভারত চষে বেড়াতে হয়েছে। ব্যাঙ্কের যত রকমের কাজ, সব কটাতেই পারঙ্গম হবার দায়। ঝড়ের গতিতে টাকা গোনা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষিতে ঋণ দেবার সাত সতেরো। কাজ করাতেই দীপের রোমাঞ্চ। ডাকাবুকো টাইপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে নাম ছড়ায়। তারপর যেন আপন অধিকারবোধেই স্থান করে নেয় ব্যাঙ্কের ইন্সপেকশান ডিপার্টমেন্টে। এটা বুঝি তার সার্ভিস কেরিয়ারে এক ধুন্ধুমার বাঁকবদল। অনেকের সঙ্গে বনিবনা না হলেও ব্যাঙ্কের স্বার্থরক্ষার্থে তার অবদানকে ম্যানেজমেন্ট স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। দীপ এখন একজন জবরদস্ত ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর। অন্য অনেক রাজ্য কভার করার পর সদ্য পা রেখেছে বেঙ্গল সার্কেলে। লক্ষ্য, তিনটি বিশেষভাবে চিহ্নিত মাঝারি মাপের ব্রাঞ্চের কাজ-কারবার খুঁটিয়ে দেখা। প্রথমটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কোলবেল্ট এরিয়ার ব্রাঞ্চ লাউদহ, দ্বিতীয়টি বাঁকুড়ার মেজিয়া, তৃতীয়টি সাগরদ্বীপের রুদ্রনগর। প্রথম দুটির ইন্সপেকশন সমাপ্ত। এবার তৃতীয়টির দিকে চলেছে দীপ পাণিগ্রাহী।

লোকাল হেড অফিসের আয়তন, বৈভব, গাম্ভীর্য লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে মানসিকভাবে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন। দীপ সুউচ্চ সোপানের শেষ বাঁকে পা রেখে বাইরের দিকে মিনিট দুয়েক তাকিয়েছিল। অদূরে বাবুঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক,

আবর্জনাবাহী গঙ্গায় রোদ্দুরের ঝিকিমিকি, একাধিক টালমাটাল নৌকা, মাঝারি মাপের একটি নিশ্চল সওদাগরি জাহাজকেও অস্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের অসহনীয় তাপ-উত্তাপ নিয়ে মাইকিং স্লোগান, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলির ভূমিগ্রাসে আর কোনও টালবাহানা নেই, অনেক পুরনো কারখানার জমিতে শতকোটি টাকার হাইরাইজিং, মোড়ে মোড়ে নানা চেহারার শপিং মল, সূর্য ডোবার আগেই নগরজুড়ে যেন দীপাবলি, মাথায় হেলমেট না রেখে মুখ থেকে মদের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে ঝড়বেগে বাইক ছোটানো এখন নব জমানার অভ্যেস...। সব মিলিয়ে দীপের মনে হল, কলকাতা আর ঠিক কলকাতাতে নেই।
আকাশ-পাতাল না হোক ফারাকটা নজরে আসে। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আরম্ভ করে ডালহৌসি ছুঁয়ে স্ট্র্যান্ডরোড অবধি তার নজর ছিল সন্ধানী। ভালো লাগেনি মাইলের পর মাইল বিরাট বিরাট রাজনৈতিক কাটআউট ও স্তুতির বহর।

যাই হোক, ব্যাঙ্কের লোকাল হেড অফিসের কাজটা চটজলদি সেরে ফেলল দীপ। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সাগরদ্বীপের রুদ্রনগর আর ঢিলছোঁড়া দূরত্বে নয়। লোকাল হেড অফিসের এক সিনিয়র অফিসার হিসেব করে দেখালেন, স্ট্র্যান্ডরোড থেকে যাত্রা শুরু করে সাগরদ্বীপে পৌঁছতে দীপ পাণিগ্রাহীর সময় লাগবে মেরেকেটে আড়াই ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা। সুতরাং দীপ যখন রুদ্রনগর ব্রাঞ্চে পা রাখবে তখন ব্রাঞ্চের পিক আওয়ারস। কাস্টোমারদের ভিড় ও কর্মীদের তথা আধিকারিকদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। দীপ ইচ্ছে করলে তার অবেক্ষণকর্মকে অনেক রাত অবধি টেনে নিয়ে যেতে পারবে প্রথম দিনেই। আর সে যতক্ষণ ব্রাঞ্চে থাকবে, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সমেত সকল অফিসার ব্রাঞ্চ ছেড়ে বের হতেও পারবে না। সেই অমোঘ সুবিধাটাও তো রয়েছে— ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহী তার জীবনের একটা বড় অংশ কলকাতাতেই কাটিয়েছে; বাংলার যে কোনও প্রান্তে এখনও সে যেন রণপা লাগিয়ে চক্কর কেটে আসতে পারে। বাংলায় কথা বলায় ও লেখায় তাকে প্রায় তুখোড়ই বলা যায়। দীপ নিজেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, যদিও জীবনে এই প্রথম সে সাগরদ্বীপে পা রাখতে চলেছে। শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সে সাগরদ্বীপকে দেখেছে। মকর সংক্রান্তি। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও সাধু-সন্তদের চমকপ্রদ সমাবেশ। এতদিনে অফিসের দৌলতে সেই পুণ্যতীর্থে তার দাপুটে পদার্পণ ঘটতে চলেছে।

ব্যাঙ্কের গাড়ি, যা তাকে পৌঁছে দেবে স্বপ্নালোকের সাগরদ্বীপের প্রবেশমুখে। পথ একটু ফাঁকা পেয়েই তিরবেগে ছুটছে। কলকাতার বুকে এখন অনেক উড়ালপুল। তবুও জ্যামের কবল থেকে রেহাই মেলা দায়। রকমারি আওয়াজ। গাড়ি যখন দাঁড়িয়ে পড়ে, দীপের ফুরসত মেলে চারদিকটা জরিপ করার। ফুটপাথগুলিতে হকার ও পথিকদের ভিড় ক্রমাগত ঘন হচ্ছে। ওরই মধ্যে তিনটি মোড়ে জোরালো স্ট্রিট কর্নার। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে বিরোধী দলগুলির ক্ষোভ ফেটে পড়ছে। দীপের ভয়, এখনই আবার পুলিশের সঙ্গে মারপিট শুরু না হয়ে যায়। তখন আলাদা কোনও ঘুরপথের সন্ধান করতে হবে অকুস্থলে পৌঁছে যাবার জন্য। হয়তো অনেকটা সময় ক্ষয়ে যাবে তাতে। এতটা পথ এল, অথচ কোথাও একটা কৃষ্ণচূড়া বা শিউলি গাছ নজরে এল না। দীপের খারাপ লাগছে।

কিন্তু ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছে যেতেই পারিপার্শ্বিক রম্যতা বেড়ে যায়। একাধিক কৃষ্ণচূড়া আর শিউলি গাছ দৃষ্টিকে টেনে নেয়। দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করে এখানকার গঙ্গা— যা ক্রমশ প্রসারিত উচ্ছ্বসিত হতে হতে সাগর ছুঁই ছুঁই। দীপের ঘন চুলে ভেজা বাতাসের হিল্লোল। দীপ চাইছে, ফি বছর সে যেন এখানে আসতে পারে। কোনও অফিসিয়াল ডিউটিতে নয়, এখানকার প্রাকৃতিক সম্ভারকে আরও বিভোর হয়ে উপভোগ করতে। মধ্যবয়স অবধি যে পুরুষ অকৃতদার, অতীত ও প্রকৃতির সঙ্গে তার সহাবস্থান তুলনায় নিবিড়ই হয়ে থাকে।

নারীর সাহচর্য কালেভদ্রে জুটলেও বন্ধন বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে অনেক সময় নিজের অবচেতন মনে অকল্পনীয় কিছু স্বপ্ন এসে হানা দেয়। নিভৃতির ফসল সেই সব ছবি বাস্তবের দীপকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলতে চায়। কিন্তু পারে না।

লট নম্বর আটে এসে থামল গাড়ি।

ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'স্যার, গাড়ি আর যাবে না। আপনাকে এখানেই নামতে হবে। ওই দেখুন, লোকেরা লাইন দিয়ে লঞ্চে ওঠার টিকিট কাটছে। আপনাকেও কাটতে হবে। তারপর জেটি ধরে লঞ্চে উঠবেন। ওপারে কচুবেড়িয়া। জিপ, স্যাটল কার, বাস, ভ্যান রিক্সা যা হোক একটাতে চেপে নেমে পড়বেন রুদ্রনগরে। সাগরদ্বীপের শহর। সেখানেই আমাদের ব্রাঞ্চ।

এবার বলুন, আমি আবার কবে কখন এখানে আসব আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে! ড্রাইভার বেশ বাক্যবাগিশ। এক লপ্তে অতগুলি কথা বলে গেল। দৃষ্টিতে শীতলতা। অনুমান, এ লোক নিজের পাওনা-গণ্ডা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। আবার আষ্টেপৃষ্ঠে রয়েছে দায়িত্ববোধও।

দীপ গম্ভীর গলায় জানিয়ে দেয়, 'আমি হেড অফিসে যা জানাবার, জানাব। দরকার হলে তাঁরা আবার আপনাকে পাঠাবেন। নিন, এটা রাখুন।'

দীপের হাত থেকে সবুজ রঙ পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিল ড্রাইভার। কপালে ঠেকায়। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। গাড়ি ঘুরিয়ে সে মুহূর্তে অদৃশ্য।

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212

2nd Floor, Kolkata - 700 001

Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782

Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81

Email : saraogiudyog@eth.net

www.saraogiudyog.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

S. N, Kejriwal

দীপের দুই কাঁধ জুড়ে একটা বড় ব্যাগ। ব্রিফকেস তার অপছন্দ। সে এমন ব্যাগ টেনে বেড়ায়, যার মধ্যে নিজস্ব সব কিছুই ঠাসাঠাসি অবস্থায়। ল্যাপটপ, ট্যুরডায়েরি, তিন সেট জামা-প্যান্ট, গুচ্ছের দরকারি কাগজপত্র, ব্রাশ ও পেস্ট, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, চুলের তেল এবং মদকতাময় দামি সেন্ট। ওই ব্যাগ কাঁধে ওঠা মানেই দীপ পাণিগ্রাহী মুহূর্তে এক রোবটে রূপান্তরিত— দয়া, মায়া, প্রেমপ্রীতি ইত্যাদির কুহক আর পাত্তা পাবে না। ক্রমাগত অভিজ্ঞতায় শান দিতে দিতে দীপ আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই সুযোগ করে নেবার কৌশল আজ তার করায়ত্ত। এই সময়ে তার মোবাইলের ইনবক্স মেসেজ কতটা পুষ্ট হল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নাস্তি। ফেসবুকে বা হোয়াটস্ অ্যাপে কে রিপ্লাই চাইছে, কেয়ার করে না। সেই লড়াকু দীপ এখন জেটিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ উল্টোদিক থেকে আসা যাত্রীবাহী স্টিমারের জন্য। অচিরেই দেখতে পেল লম্বা লঞ্চটা দ্রুত এগিয়ে আসছে জেটির দিকে। প্রতীক্ষারত যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য বাড়ে। নৈঃশব্দ্য বলতে কিছু নেই। নির্বিকার থাকবার ভানও কেউ করছে না। এই সময়ে ভারী পাষাণও নড়েচড়ে ওঠে। একমাত্র দীপই এই ব্যস্ত সময়ে তার মোবাইলটা বের করে কয়েকটা বোতাম টিপল জেটির কাঠ-কাঠামোয় ভর দিয়ে।

'হ্যালো, আপনিই কী কাকদ্বীপ ব্রাঞ্চের মিস্টার হরেন গুছাইত?'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহী বলছি।'

'ও স্যার আপনি— আপনি এখন কোথা থেকে বলছেন?

কোথায় গেলে আমি আপনার সঙ্গে মিট করতে পারব, স্যার...?'

'আমি রুদ্রনগর ব্রাঞ্চে ঢুকে যাব আধঘণ্টা থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে। আপনি সোজা ওখানেই চলে আসুন। আপনি না আসা অবধি আমি কাজ শুরু করতে পারব না।'

'আমি এখুনি কাকদ্বীপ ব্রাঞ্চ থেকে রওনা দিচ্ছি ডেপুটেশনের চিঠিটা নিয়ে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লঞ্চ থেকে যারা বেরিয়ে যাবার, চলে গেল সারিবদ্ধভাবে। তবে শূন্যস্থান যারা ভরাট করবে, তাদের তাড়াটা বেশি। টিকিটচেকার খুব হুঁশিয়ার। উইথআউট টিকিট একটি মশাকেও গলতে দেবে না। ক্রমে দেখা গেল, যাত্রীরা যেন সব একটি একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য। যে যেখানে পারছে, নিজেকে গুঁজে দিচ্ছে। কারুর বিরক্তি বা উষ্মা নেই। অধিকাংশ সজীব। দুটি-একটি গম্ভীর অথবা বিমর্ষ মুখাবয়র।

দীপের পছন্দ ডেকের রেলিং লাগোয়া বেঞ্চের যে কোনও একটি স্থান। সে ওরকম একটি ঠাঁই জোগাড়ও করে নেয়। সাগরমুখী গঙ্গার আছাড়ি-পিছাড়ি দেখবার এই সুযোগ তার মতো ঘুরন চরকি লোকের কাছেও দুর্লভ। ওই রূপ দেখতে দেখতে সে বিভোর। পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে একেবারেই ভাবছে না। অদ্ভুত একাকীত্বের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে সে।

ইন্সপেকশন করার চক্করে ভারতের কাঁহা কাঁহা মুলুকে ঢু মেরেছে সে। পরিবার বলতে তো কিছু নেই। যেখানে যায়, সেটাই তার নিজভূমি হয়ে ওঠে কয়েকদিনের জন্য। তবে সবকিছু দ্রুততার সঙ্গে সামলে-সুমলে এভাবে জলযানে জুত করে বসে থাকবার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। হয়তো একদিন পোর্টব্লেয়ার ব্রাঞ্চে যাবার নির্দেশ আসবে। সেদিন সে প্লেনের পরিবর্তে জাহাজে গিয়েই উঠবে। সাক্ষাৎ সমুদ্রের হাতছানিকে উপেক্ষা করার মতো বুড়বক সে নয়।

তবে যেখানেই যাক, অফিস তাকে সাধ্যানুসারে সুবিধা দেবার চেষ্টা করে। থ্রি-স্টার হোটেলে ওঠার পারমিশন আছে। মোটা অঙ্কের হল্টিং অ্যালাউন্স। ব্যাঙ্কের স্থানীয় কোনও শাখা থেকে এক বা একাধিক ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্টকে ডেপুট করা হবে ইন্সপেকশনের কাজে সাহায্য করার জন্য। যেমন এখানে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে হরেন গুছাইতকে। যদিও দীপ ও হরেন পরস্পরের কাছে অপরিচিত। জোনাল অফিস জানিয়েছে কর্মী হিসেবে গুছাইত নাকি অনন্য— ঝড়ের বেগে টাইপ করতে পারে। নোট গোনায় তুখোড়... সবচেয়ে বড় কথা, পাঁচটার পর আরও কিছুক্ষণ কাজ করতে হলেও ওভারটাইমের জন্য ঝুলোঝুলি করে না। ব্যাঙ্কের এই পদে যে ক্ষমতা ও প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস, দীপের কাছে তা উপভোগ্য। অচেনা ভূখণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের ভুলভ্রান্তি, এমনকী মারাত্মক দুর্নীতিকেও অপ্রকাশ্য রাখতে কত রকমের চাপ, রাজনীতি ও মস্তানিও আসতে পারে মনোবল তথা নিরাপত্তাকে চূর্ণ করতে— এইসব অসুবিধাগুলি অতিবাস্তব। দীপ এ অবধি এরকম পরিস্থিতিতে না পড়লেও মানসিক দিক থেকে সে প্রস্তুত। তার মানসিক গঠন আলাদা ও মৌলিক। তার বিশ্বাস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি নিষ্কলুষ রাখা সম্ভব হয়, সার্বিকভাবে ভারতের জনগণ নিরুদ্বেগে, শান্তিতে এবং আনন্দের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। আবর্জনাবাহী

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দীপ তার বাবার শেখানো একটি স্তোত্র অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করে—

সর্বেষাং মঙ্গলাং ভূয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ ভবেৎ।।

নদীর অফুরন্ত উচ্ছ্বাস প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। যাত্রার প্রারম্ভে খুব কেঁপেছিল লঞ্চটি। তারপর এর প্রশান্তি গভীর থেকে গভীরতর। কত কী নিয়ে কল কল খল খল প্রবাহ। দীপ দেখল, কামিনীফুলের একটি মালাও ছুটছে। ওই মালায় কী বশীকরণের মন্ত্র লেখা আছে? যে দেখবে, সেই বশ মানবে এই নদীর! ওই মালাটার দিকে তাকিয়ে থাকবার সময়ই অকস্মাৎ দীপের স্মৃতিতে সপাটে ঘাই মারল তার হারিয়ে যাওয়া দক্ষিণী বান্ধবী বিদ্যাশ্রী পট্টাভিরমণ। পরক্ষণে দীপ নিজেকে শাসায়, ওই স্মৃতি আর নয়। ব্যর্থ প্রেমের প্ল্যাকার্ডটাকে সে এবার একেবারে উপড়ে ফেলতে চায়। বয়স প্রৌঢ়ত্বের গোড়ায় এসেছে। আসুক। দীপ এবার লম্বা ছুটি নিয়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবেই। নিজেকে নিয়ে এভাবে লোফালুফি খেলবার অধিকার কী তার সত্যি রয়েছে?

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে মধ্যবয়সী দীপ পাণিগ্রাহী যখন এইসব অন্তর্লীন ভাবনায় বুঁদ, তার পাশের শীর্ণকায় লোকটি নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গিয়ে চেপে ধরল রেলিংটাকে। আর সেই সুযোগে কে একজন বসে পড়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে। এর বপুটি আবার বৃহৎ। আতরের ঘ্রাণ পর্যাপ্ত। দুই হাত সে ওপরের দিকে এমনভাবে তোলে যেন আড়মোড়া ভাঙছে।

দীপ ঘুরে লোকটার মুখের দিকে তাকায়।

লোকটাও দেখল তাকে।

প্রকৃতই মুখোমুখি।

ক্রমে পরতে পরতে বিস্ময়— যা দু-জনকেই হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে দাঁড় করায় একটা পুরনো সময়দীর্ণ প্ল্যাটফর্মের ওপর।

তোলপাড় করার মতো কিছু নয়। আবার অস্বস্তিতে আক্রান্তও হতে হচ্ছে না। তুলকালাম ঘটনার স্মৃতি নেই। কিন্তু সেই পিছনের সময়টাকে একেবারে খড়কুটো ভেবে নস্যাৎ করাটাও অমানবিক। স্মৃতি যতই গুরুত্বহীন হোক, তাকে পাংশু বলা যাবে না। বুকে মধ্যে ঢাকঢোল বাজছে।

মুখ খুলল দুজনে প্রায় একই সময়ে।

'তুই! দীপ!'

'তুই তো সেই আব্বাসউদ্দিন।'

মাথার ওপর মেঘমুক্ত নীলাকাশ। তলায় অক্লান্ত বেগবতী গঙ্গা। এই বিশাল স্বর্গীয় পরিবেশে তালেবর বলতে কেউ নেই। সকলেই ছোট ছোট খোলামকুচি মাত্র। তবুও তারা দু'জন দু'জনকে প্রথম নজরেই চিনতে পারল, সময়ের ব্যবধান কম না হওয়া সত্ত্বেও। পৃথিবীটা যে আয়তনে ছোটই, এটা যেন তারই এক অভ্রান্ত প্রমাণ। বাস্তব হল এই যে, দীপ পাণিগ্রাহী ও আব্বাসউদ্দিনের মধ্যে কোনওকালেই প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তারা কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদাপি চূড়ান্ত সহমর্মিতা দেখায়নি। ঘনিষ্ঠতা এমনও ছিল না যে কফি হাউসে ঢুকে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসত অথবা হাত ধরাধরি করে রাজপথে গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে সুন্দরীদের নিয়ে হরেক কিসিমের মত বিনিময় করত। মিল কেবল একটাই— তারা দু'জনই ছিল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের সুতো টানাটানিকে কেন্দ্র করে তারা একজন অপরজনকে চিনত। সবমিলিয়ে এইক্ষণে তারা পরস্পরকে যেভাবে শনাক্তকরণ করতে পারল, সেটা কমবেশি অপ্রত্যাশিত।

ওই দিনগুলিতে কলেজে আব্বাসউদ্দিনের একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। সে খুব সম্পন্ন মুসলিম পরিবারের ছেলে। বড়বাজারে তাদের যেমন জামা-কাপড়ের দোকান আছে, তেমনি রয়েছে একটি ঝলমলে জুয়েলারি শপও। প্রতিবছর হজযাত্রীদের তালিকায় আব্বাসের আব্বাজানের নাম থাকবেই। দক্ষিণ কলকাতায় একটি মসজিদ নির্মাণে ওই পরিবারের তরফ থেকে ডোনেশন এসেছিল একুশ লক্ষ টাকা— যার পঞ্চাশ শতাংশ টাকা আয়করে রেহাই দিয়েছিল সরকার।

দীপের তখন তেমন পরিচিতি ছিল না। ভালো ছাত্র, কিন্তু কোনও নামি প্রফেসরকে পাকড়ে যে মূল্যবান 'নোট' হাতাবে, সেই আর্থিক চাওয়া-পাওয়া ছিল তার নাগালের বাইরে।

বাবা সাধারণ পোস্টমাস্টার। ছেলে ও মেয়েকে নতুন পোশাক কিনে দিতে পারলে বাড়িতে নেমে আসত রূপকথার আবহ। কিছু খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত তো মনে আসবেই। একদিন কলেজে খবর এল, বৈদ্যুতিক তারের মহাজটিলতাহেতু বড়বাজারের একাংশে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়া মাত্র উদ্বেগের বুদবুদ নিয়ে আব্বাস যখন পড়ি কী মরি ছুট

লাগিয়েছে, দীপ তার সাথী হয়েছিল। আগুন অচিরে নিয়ন্ত্রণে আসে। সেই একদিনই পরিস্থিতি তাদের কিছুটা ঘনিষ্ঠ করে। পরবর্তী দিনগুলির রসালাপ হাসাহাসি স্মৃতি নিতান্ত ধোঁয়াশাময়।

হাতে হাত মিলেছে। একজন অন্যজনকে যে প্রথম নজরেই চিনতে পেরেছে, হতচকিত হয়নি, এ এক বড় আশ্বাস। নচেৎ সময়ের ঘূর্ণি ঝাপটায় দৈহিক পরিবর্তন অনস্বীকার্য। সেদিনের বদহজমের ভুক্তভোগী শীর্ণকায় দীপ এখন এক ঝকঝকে বলিষ্ঠ পুরুষ। পোশাকের বাহারে সাহেবিয়ানা। গাঙ্গেয় বাতাসের দাপটে নীল টাই পতাকা হয়ে উড়তে চায়। চশমার ওপর বাড়তি কালো কাঁচ বুঝতে দেয় না লোকটির আদত অভিব্যক্তি। পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটাঘাঁটি করার তার আদৌ কোনও তাগিত আছে কিনা বোঝা দায়।

অন্যদিকে ঘি রঙা পাঞ্জাবি, ধবধবে পাজামা, নাগরাই জুতোতে শোভিত আব্বাসউদ্দিন লম্বা-চওড়া থলথলে মাংস-চর্বিতে ঠাসা এক পৃথুল দেহকাণ্ড। দেখলেই মালুম হয়, লোকটা মালদার। চোখে চশমা না থাকায় দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ চাতুর্য ও বেপরোয়া ভাব লক্ষণীয়। ছাত্রজীবনের সেই বলশালী ও দ্রুতগামী আব্বাস যেন এ নয়। তখন তো তার শরীর থেকে বের হতো ঘামের গন্ধ। এখন আতর-সুবাস ভুর ভুর। এবং মাথায় টাকঢাকা ওই একখানা ঢাউস ফেজ টুপি। সাদা টুপিতে সোনালি সুতোয় গাঁথা গুটিকয়েক উর্দু হরফ। সম্ভবত বিশ্বনবির কোনও বাণী।

'আমি ভাবতেই পারছি না, সাগরদ্বীপে যাবার পথে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তাও আবার নদীর বুকে।'

উচ্ছাসের প্রথম লহর বেরিয়ে আসে দীপের গলা দিয়ে।

'আমি তো এই পথের প্রায় নিয়মিত যাত্রী। তোর দেখা মেলাটা অকল্পনীয়। খোদা মেহেরবান।'

আব্বাসের কথাগুলি অধিক পরিশীলিত।

এরপর প্রথম প্রশ্নটাও এল আব্বাসের কাছ থেকেই— 'যাবি কোথায়? কপিলমুনির আশ্রম? মকর সংক্রান্তিতে আসতে সাহস হয়নি বোধহয়! চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবার ভয়!'

দীপ সশব্দে হেসে ওঠে, 'আশ্রমে তো আলবত যাবো। তবে আগমনের আদত কারণটা পার্সোনাল নয়, পুরো অফিসিয়াল।'

'মানে?'

'আরে তোর পুরানা দোস্ত দীপ পাণিগ্রাহী এখন পদমর্যাদায় একজন ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর। সারা ভারত চষে বেড়াই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চগুলি ঠিক ঠিক কানুন মোতাবেক কাজ কারবার করছে কিনা তা বাজিয়ে দেখতে। অনেক রকমের যানবাহনে চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছি। ভ্যানরিক্সা থেকে আরম্ভ করে ঘোড়া অবধি। তবে লঞ্চের সাওয়ারি হয়ে একটা বড় দ্বীপে পা রাখবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

মনের মতো শব্দ সাজিয়ে টানা বলে গেল দ্বীপ।

দীপের কথা মন দিয়ে শুনলো আব্বাস। কিছু ভাবান্তরের ছায়া যেন দেখা গেল তার মাংসল মুখের অভিব্যক্তিতে।

দীপ থামলে সে বলতে শুরু করে, 'তার মানে তুই বেশ দাদাগিরি দেখাবার সুযোগ পাস। আমার নসিবে আবার সেটা নেই। আল্লাহ তালার যেমন মর্জি। বাপের কারবারটাকে আড়াই গুণ বাড়িয়েছি। ছিল জামাকাপড় আর অলঙ্কার। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইট, সিমেন্ট, বালি, লোহা। লোকেরা আঙুল তুলে বলে, সিন্ডিকেটের পাণ্ডা। বলুক। নেতারা তো খুশি— মাল পাচ্ছে। এই রুদ্রনগরেও আমার একটা জুয়েলারির বড় দোকান আছে। ঈমান জুয়েলার্স। গহনার একমাত্র দোকান। অল ডিজাইনস্ আর নিউ অ্যান্ড সেকেন্ড টু নান। তবে বুক বাজিয়ে বলবার মতো বিক্রিবাটা নেই। তবে ভবিষ্যতে হবে। সি-এম স্বয়ং বলেছেন, আর বছর কয়েকের মধ্যে সাগর একটা বন্দর হয়ে উঠবে।'

দীপ গলা খাঁকারি দেয়, 'সোনা রূপা হিরে জহরত। শতকরা নিরানব্বুই জন মহিলার অব্যক্ত বাসনা। আমাদের লোকশিক্ষাতেও এই বাসনার বহু উপমা। অর্থাৎ তুই এখন একজন যথার্থ ধনী লোক। কোটি টাকা তোর হাতের ময়লা। তাই না রে?'

আব্বাসউদ্দিনের নিঃশ্বাস জোরালো হয়। হাসি হাসি মুখের থলথলে চামড়া কাঁপে। পরক্ষণেই কপালে ভাঁজ, 'তুই কী এখন রুদ্রনগরের ব্যাঙ্কটাতে ঢুকবি?'

'ঠিক ধরেছিস।'

আব্বাসের পরবর্তী জিজ্ঞাসা একটু বুঝি বিদ্‌ঘুটে, 'কী দেখবি ওই ব্রাঞ্চের?'

'বলতে গেলে সে এক বিরাট ফিরিস্তি। তাই বলতেও চাই না। আমি বিয়ে করিনি। করলে, স্ত্রীকেও বলতাম না। কেবল এইটুকু বলছি, তিন দিনের মধ্যে ওই ব্রাঞ্চের সব কিছুকে আমি আতস কাঁচের তলায় এনে ফেলবো। আচ্ছা, তোর কী ওই ব্রাঞ্চে কোনও অ্যাকাউন্ট আছে?'

'আছে। ব্রাঞ্চের হেড কেশিয়ার সুশীল চক্রবর্তী আমার জিগরি দোস্ত। খুব ভালো মানুষ। কাজেরও। চল, আজ তোর সঙ্গেই ব্রাঞ্চে একবার ঢুকবো। আপত্তি আছে?'

'আপত্তি জানাবার এক্তিয়ার আমার নেই। বিকজ ইউ আর এ ভ্যালুড কাস্টোমার দেয়ার।'

আব্বাসউদ্দিন ফেজ টুপিটাকে একবার ঘুরিয়ে নেয় তার মাথায়। লঞ্চ কচুবেড়িয়ার জেটিতে ঢুকছে।

রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে যে অশান্তির দাবানল, কচুবেড়িয়াও সেখানে শান্তির রূপকথা হয়ে উঠতে পারে না। একটি রাজনৈতিক দলের ডাকা ছয়ঘণ্টার বন্‌ধকে কেন্দ্র করে এখানেও ছুটকো অশান্তি। পুলিশ-প্রশাসন-ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার বাহিনীর তৎপরতা অপরিসীম। দোকানপাট অফিস সব খোলা। তবুও ওইরকম চাপ সামলে কচুবেড়িয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থায় আজ স্পষ্টত ছন্নছাড়া ভাব। স্ট্যান্ডে একটিও বাস নেই, ট্রেকার নেই, জিপ নেই, রিক্সা নেই, থাকবার মধ্যে গুটিকয়েক ভ্যান। তীব্র অনিচ্ছাকে কাটিয়ে তারা নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে ক্রাইসিসের সুযোগ নিয়ে বাড়তি কামাবার লোভে। আজ রেট হাই। অথচ ওদের এড়িয়ে যাবে, এরকম মজবুত লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। ভ্যান ভাড়া নেবার জন্য যারা এগিয়েছে, আব্বাসউদ্দিন তাদের সকলের চেয়ে আলাদা। তার প্রতি ভ্যান চালকদের আগ্রহ দেখলে বোঝা যায়, এখানে এই মুহূর্তে অবিকল তার মতো আকর্ষক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ নেই।

আব্বাস একটা গোটা ভ্যান ভাড়া করল। সওয়ারি মাত্র দু'জন— সে নিজে এবং তার কলেজ জীবনের দোস্ত দীপ পাণিগ্রাহী।

ভ্যান চলেছে একটা বাগানবাড়ির লম্বা দেওয়াল ঘেঁষে। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকেশনের দৃশ্যপটে পরিবর্তন আসে। গ্রামীণ ছোঁওয়া আর নেই। দু'দিকেই শহুরে পাষাণভার। পথে প্রচুর ছেঁড়া পোস্টার। বাতাসে বারুদের গন্ধ। ভ্যানে জুত করে বসেছে দীপ। কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর শুরু হল দু'জনের মধ্যকার ফিসফিসানি।

আব্বাস : ব্যাটা, তুই শাদি করিসনি কেন?

দীপ : মনমতো যাকে পেয়েছিলাম সে ফস্‌কে গেল। তারপর একটাও মানানসই পাত্রী পেলাম না। এবার তুই নিজের কথা বল। হারেমে তোর বিবির সংখ্যা কত?

আব্বাস : গত মাসেও তিন ছিল। এমাসে সংখ্যাটা কমে হয়েছে দুই।

দীপ : শূন্যতা পূরণ করে ফেল।

আব্বাস : তোড়জোড় চলছে।

দীপ : আর ছানাপোনা?

আব্বাস : আপাতত দশ।

দীপ : বাহ্ বাহ্। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো— এ যেন মুজিবের সেই ডাক।

আব্বাসের চোখে ধূসরতা নামে। রুদ্রনগরে নাগরিক ছাপ পর্যাপ্ত। আবার মাঝেমাঝে পথের দু'পাশে এমন কিছু সবুজেরও বিস্তার— যা নবাগন্তুকদের কাছে বিলক্ষণ দৃষ্টিনন্দন।

ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ বিল্ডিং উচ্চতায় ও প্রস্থে যথেষ্ট। গেটে দারোয়ান আব্বাসকে দেখে গদগদ, সজোরে বুট ঠুকে সেলাম সারে। দীপের ভ্রূকুঞ্চন। আব্বাসের কাছ থেকে ব্যাটা নিশ্চয় মাঝে মধ্যে কিছু পেয়ে থাকে।

'আগে চল, আমার বন্ধু সুশীল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। পদমর্যাদায় খাজাঞ্চিবাবু।'

আব্বাস দীপের একখানা হাত ধরে টানে।

হাত ছাড়িয়ে দীপ গম্ভীর গলায় জানায়, 'না। তাতে প্রোটোকল ব্রেক করা হবে। তুই গিয়ে তোর বন্ধুর কাছে বসতে পারিস। আমি ঢুকবো ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে। আর তখন থেকেই ব্রাঞ্চের সমস্ত কিছু চলে আসবে আমার হাতে। জাস্ট ফর অনলি থ্রি ডেজ।'

আব্বাসের চোখের মণি নাচে কৌতুকে অথবা পুরনো বন্ধুর অফিসিয়াল স্ট্যাটাসকে উপলব্ধি করে।

ব্রাঞ্চের ভেতরটা অনেকখানি লম্বালম্বি। কাউন্টারের সংখ্যা পনেরো। কোনওটির সামনে গ্রাহকদের লম্বা লাইন। কোনওটাতে সামান্য কয়েকজন গ্রাহক আলোচনারত আধিকারিকের সঙ্গে। প্রত্যেকের সামনে কম্পিউটার। দৃষ্টি তাদের অন্তর্মুখী।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বার মোটামুটি উন্মুক্ত, যদিও স্টিল গ্রে পর্দা ঝুলছে। দীপ ঢুকে দেখল, চেম্বারে ম্যানেজার একা। নবীন বয়সি। হয়তো দীপের মতো প্রবেশনারি অফিসার। গায়ের রঙ যেন পাকা জাম। মাথার চুল কুচকুচে, ঢেউ তোলা। নির্মেদ দেহ কাঠামো। চশমার আড়অলে স্নিগ্ধ নজর। টেবিলের ওপর নেম প্লেট— শ্রী নির্মল চ্যাটার্জি।

দীপ তার পরিচয়পত্র ও অফিসিয়াল লেটারটি পেশ করতেই শাখা ব্যবস্থাপক সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়, 'স্যার, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

গরম কফি উপাদেয়। পাকোড়াগুলি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ নাও হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতই সুস্বাদু।

গোটা ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে দীপকে। ঠিক এই সময়ই চলে এলো ডেপুটেড ক্লার্ক-টাইপিস্ট হরেন গুছাইত। মাঝবয়সী। তামাটে বর্ণ। গাট্টাগোট্টা। কাঁচাপাকা হিটলারি গোঁফ। আপন অভিজ্ঞতায় এই লোকটা বুঝেছে, ব্যাঙ্কিং সার্ভিসে প্রমোশন নিলে অনেক রকম ঝামেলা ফেস করতে হয়। যত্রতত্র বদলি, নানা দায়-দায়িত্ব। ক্লার্ক হয়ে থাকলে বেতন মোটামুটি ভালোই, দশটা-পাঁচটা ডিউটি, স্ত্রীর মুখ ঝামটা কম, শাকরেদদের কাঁধে হাত রেখে চুটিয়ে ইউনিয়নও করা যায়। গুছাইত ক্লার্কই থেকে যেতে বদ্ধপরিকর চাকরির বাকি দিনগুলিতে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পাণিগ্রাহী ও গুছাইতকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখায়। শেষমেষ হেড খাজাঞ্চির নাতিবৃহৎ চেম্বার।

খাজাঞ্চি সাহেবের মুখোমুখি তখনও বসে রয়েছে আব্বাস। হেড কেশিয়ার সুশীল চক্রবর্তীকে দেখলে মনে হবে, দু-এক বছরের মধ্যে তাঁকে অবসর নিতে হবে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। দীর্ঘ চর্বিবহুল দেহ।

ব্রাঞ্চ ইন্সপেক্টর ঢুকেছে— এ বার্তা নির্ঘাত পেয়ে গিয়েছে আব্বাসের কাছ থেকে। ইন্সপেক্টরটি আবার আব্বাসের ছাত্রজীবনের বন্ধু— বার্তা হিসাবে এটা নিশ্চয় তার কাছে স্বস্তিদায়ক।

তবুও ইন্সপেক্টর মানেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সমীহ করতেই হয়। এদের রিপোর্ট কখন কতটা ভীষণাকৃতি হয়ে উঠতে পারে, ঈশ্বর ছাড়া আর কারোর পক্ষে জানা অসম্ভব। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ফিরে গিয়েছে তার চেম্বারে। যাবার আগে ব্রাঞ্চের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চাবিগুলি তুলে দিয়েছে ইন্সপেক্টরের হাতে। এটাই দস্তুর ব্যাঙ্কিং রুলসে।

অকুস্থলে তখনও উপস্থিত আব্বাস। পরিচয়পর্ব সমাপ্ত হবার পরও সে যেন খানিক দোলাচলে— দীপের দেখভালে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে, কোনও অসুবিধা বা অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকে, ...এই সবও সুনিশ্চিত করতে চায় সে।

দীপ মুচকি হেসে আব্বাসকে বলে, 'তুই তো অংশত এখানকারই লোক। বিশাল ব্যবসা। ভ্যালুড কাস্টোমার। আনাচে-কানাচে কোথায় কী আছে, সব তোর নখদর্পণে। রুদ্রনগরে তিনদিন তিন রাত কোথায় থাকবো, সেই হদিশ আমি তোর কাছ থেকেই নেব।'

দীপের কথায় পরিবেশ কিছুটা অন্তত লঘু হয়। আব্বাস তার টুপিটাকে আর একবার ঘোরায়। তারপর নাগাড়ে বলে যায়, 'আমি এখানে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আর একবার আসবো। অধমের এই দ্বীপে কেবল দোকান নয়, একটি বাসযোগ্য নিবাসও রয়েছে। আমি আমার বন্ধুকে ওই বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে দেব না। দ্য রুম ইজ প্রপারলি ফারনিশড্। টিভি আছে, এ-সি আছে। এই ব্রাঞ্চ থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। আমার কথা আপাতত শেষ। ঠিক সময়ে চলে আসবো।'

নাগরায় মৃদু শব্দ তুলে বেরিয়ে যায় আব্বাসউদ্দিন।

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

এই হলো ব্যাঙ্কের ভল্ট। প্রতীকী কুবের এখানে ঘুমিয়ে আছেন। বাইরের মহিমণ্ডল, জল-বাতাস এখানকার কুবেরীয় উপনিবেশে কোনও চাঞ্চল্য আনতে পারে না। বাইরে যত টাকা পয়সার লেনদেন হয়, এই কেল্লার ধনভাণ্ডারের কাছে তা নস্যি। দীপ গুনে দেখল, ভেতরে মোট তেরটি নামি কোম্পানির বিশেষ মাপের আলমারি সারবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটিতে একশ চুয়াল্লিশ ধারা নিশ্চিত জারি রয়েছে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও হেড কেশিয়ারের যুগ্ম চাবি-স্পর্শ ছাড়া এর একটিও তার মুখকে হাঁ করবে না। বাইরে মহতী প্রীতি কিংবা উল্লাস সোৎসাহে যে বাতাবরণই নির্মাণ করুক না কেন, এ বরফ অন্দমহলে তার কোনও অনুরণন থাকে না। প্রধানমন্ত্রী, বিত্তমন্ত্রী তাঁদের বাগ্মিতায় যতই 'ডিজিটাল ডিজিটাল' রব তুলুন, ভল্ট তার গাম্ভীর্য অটুট রাখবে।

তেরোটি আলমারির মধ্যে নয়টিতে শুধুই টাকার গাঁটরি। বাকি চারটিতে গিজগিজ করছে গোল্ড লোনের ব্যাগ, নানা কিসিমের ফাইলপত্তর, ডকুমেন্টস আরও কত কী! এমন রেকর্ডও আছে, যাদের বহু বছর ধরে সামনাসামনি এনে ফেলা হয়নি। তবে পোকা-মাকড় ইত্যাদি দুষ্কৃতীদের দূর করতে সপ্তাহে অন্তত একবার কীটনাশক স্প্রে করা হয় দৃশ্যত অবহেলা ভরে।

নোটের প্যাকেট তৈরি করা হয় ডিনোমিনেশন ওয়াইজ। প্রতিটি প্যাকেটে নোটের সংখ্যা একশো। প্যাকেটগুলি আবার দু-রকমের। ইস্যুয়েবেল এবং নন-ইস্যুয়েবেল। ইস্যুয়েবেল প্যাকেটের নোটগুলি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, কিছু প্যাকেট একেবারে নতুন ঝকঝকে। নন-ইস্যুয়েবেল প্যাকেটগুলিতে শুধুই রদ্দি নোট— ছেঁড়া, ফাটা, তাপ্পি দেওয়া। বছরে দু-তিনবার ওই রদ্দি নোটের প্যাকেটগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেইগুলিকে সব পুড়িয়ে ছাই করে। ইত্যাকার কর্মচক্রে কোনও গলতি বা বেগড়বাই ইন্সপেক্টরের নজরে এলে রিপোর্টে তার প্রতিফলন ঘটবেই। যাদের হাত নুলো, তারা ব্যাঙ্কে কেশিয়ার হবার হকদার নয়। সুশীল চক্রবর্তীর হাতের আঙুলটি টেবা টেবা। ওই আঙ্গুলে কিন্তু ঝড়ের গতিতে নোট গোনা সম্ভব নয়। ঝড়ের গতিতে নোট গোনা কাকে বলে, সেটা দেখালো হরেন গুছাইত। দীপ সব প্যাকেট গোনোলা না। অধিকাংশ প্যাকেট গোনা হলো মেশিনে। একেবারে নির্ভুল। দীপ হেড খাজাঞ্চির দিকে তাকিয়ে

জানতে চায়, 'ক্যাশ ইজ ফাইন। নাউ গোল্ড লোন। গোল্ড লোন নিয়মিত দেওয়া হয়?'

'আগে গোল্ড লোন দেওয়া হোত না। চ্যাটার্জিসাহেব এসে চালু করলেন।'

'গোল্ড লোন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কত?'

'তিরানব্বুইটি।'

'বলেন কী! আড়াই মাসে নাইনটি থ্রি গোল্ড লোন! বাহ্‌বা পাবার যোগ্য। হেড খাজাঞ্চি হিসেবে আপনার পারফরমেন্স তো দারুণ।'

সুশীল চক্রবর্তী বিনয়ে মাথা নীচু করে বলে, 'আমরা পুরনো লোক। ব্যাঙ্কই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। ব্রাঞ্চটাকে প্রফিটে আনবার চেষ্টা করেছি। অন্য অ্যাডভান্সের স্কোপ যখন কম, তখন গোল্ড লোনের দিকেই নজর দিতে হল। আগের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে আমি বোঝাতে পারিনি। চ্যাটার্জিসাহেব বুঝলেন।'

'বেশ। লোন দিলেন যে সমস্ত গহনা বন্ধক রেখে, তাদের সোনার পিউরিটি কী আপনিই নির্ণয় করেছেন, নাকি কোনও রেজিস্টার্ড গোল্ডস্মিথকে দিয়ে করিয়েছেন ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে?'

সুশীল চক্রবর্তী জানায়, 'সোনা কতটা খাঁটি তা আমি কষ্টিপাথরে ঘষে মোটামুটি বের করতে পারি, স্যার। কিন্তু এখানে আমি এই কাজটাকে নিখুঁত করার জন্য স্থানীয় একজন দক্ষ স্যাঁকরার সাহায্য নিয়েছি। তিনি যে সোনার দোকানের কর্মী, সেই দোকানের স্ট্যাম্প সমেত তাঁর সার্টিফিকেট রয়েছে প্রতিটি গোল্ড লোনের ডকুমেন্ট।'

'কোথায় কাজ করেন ওই গোল্ডস্মিথ?'

'স্যার, আপনারই বাল্যবন্ধু আব্বাসউদ্দিনের জুয়েলারি শপে সব সময় কাজ করে চলেছেন। হাতের কাজ অতি চমৎকার। নাম তার রামপ্রসাদ কর্মকার।'

'কাল আমি গোল্ড লোনের ব্যাগগুলিকে খুলবো। প্রতিটি ডকুমেন্ট চেক করবো। তারপর পরশু দিন কয়েকজন লোনির বাড়িতেও যাবে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে।'

'এ নিয়ে আপনি বেশি ভাববেন না, স্যার। এভরি থিং ইজ ইন অর্ডার।'

'একজন ইন্সপেক্টরকে তার ডিউটি করে যেতেই হয়। রাইট আর রঙ পরের কথা।'

দীপের গলায় কাঠিন্য বিলক্ষণ।

এই প্রথম সুশীল চক্রবর্তী বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্রাঞ্চ ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আরও কিছু কাজ সারতে সারতে বেলা ঢলে পড়ে। ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দারোয়ানের উল্লসিত স্বর ভেসে আসে, 'সেলাম, হুজুর, আব্বাস সাহেব।'

আব্বাসউদ্দিন এসে দাঁড়ায়।

দোস্তকে নিয়ে এবার সে বের হবে।

রুদ্রনগরের শহুরে চরিত্রের কাছে সাগরদ্বীপের আর সকল এলাকা ম্লান। ক্ষণিকের জন্য মনে হতে পারে বুঝি গড়িয়ায় পৌঁছে গেলাম। এ কারণেই রুদ্রনগরকে বলা হয় সাগরের রাজধানী। তবে ভোরে পাখির ডাক অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায়। সামুদ্রিক নোনা বাতাসে শরীর অন্যরকম অনুভূতিতে আক্রান্তও হয়। সবক'টা রাজনৈতিক দলের কার্যালয় গড়ে উঠেছে, পার্টি অফিসে বসে বুড়োরা চুটিয়ে টিভি দেখে। কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে ওঠায় প্রতিটি দলের তরুণ ব্রিগেডকে চেনা গেল, যদিও এখানে এখনও সুধী নাগরিক সমাজের নাভিশ্বাস ওঠেনি। উঠবে তো নির্ঘাত। প্রকৃতির দ্বিধাগ্রস্ততা কেটেছে। চারদিন আগে কালবৈশাখী প্রথম ঝাপটা মেরেছে। সবুদ, প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অতিকায় হোর্ডিংটা বাঁধনচ্যুত অবস্থায় ঝুলছে।

চারপাশটা জরিপ করতে করতে আব্বাসের সঙ্গে প্রায় পা মিলিয়ে চলেছে দীপ। এই সেই পথ— মকর সংক্রান্তিতে যা ছিল ভিড়ে ভিড়াক্কার। কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী হিন্দুরা চলেছে কপিলমুনির আশ্রমের দিকে। আজ এই প্রায় শুনশান পরিমণ্ডলে সন্ধ্যা নামবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপ পাণিগ্রাহী সেই তীর্থে পৌঁছে যেতে পারবে বলে মনে করছে। যাবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্থানীয় আশ্রমেও। নিজের সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে দীপ মনে করে, বিপন্ন ও আর্তের সেবায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ যেভাবে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দেয়, ভারতের আর কোনও সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা তার ধারেকাছে আসতে পারে না।

পরপর অনেকগুলি দোকান পার হবার পর আব্বাস দীপকে এনে দাঁড় করালো তার জুয়েলারি শপের সামনে। বিশাল ঝলমলে সাইনবোর্ড 'ঈমান জুয়েলার্স'। সাজসজ্জায়, পরিচ্ছন্নতায় চমৎকৃত হবার কারণ থাকলেও পাটোয়ারি বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ এখানে ওই অপূর্ব তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল অলঙ্কার কিনবার মতো খদ্দের কি আছে? হয়তো আছে। অথবা ভবিষ্যতে কর্তার অভীষ্টপূরণ ঘটবেই। নিশ্চিত সাগরদ্বীপে অলঙ্কারের দোকানরূপে ঈমান জুয়েলার্সই তখন হবে

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দীপের কথায় রগড়, 'তোর তো এখানে মনোপলি বিজনেস।'

'নো ডাউট অফ ইট।'

'বেচাকেনা কেমন?'

'টুকটাক। আংটি, রিং, বড়জোর সরু চেন। শাদির সময়ে বালা-চূড়ের বরাত আসে।'

'তাহলে তোর পোষাচ্ছে কীভাবে?'

'আমি কিছুটা ব্যতিক্রমী। ভিন্ন জাতের ব্যবসায়ী। নজর ভবিষ্যতের দিকে। কোরআন বলছে, তোমার নিকট রসুল আসবে। সে তোমাকে বিপদে পড়তে দেবে না। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি সাগরে বন্দর গড়বেন। সেই বন্দর যেদিন গড়ে উঠবে, আমি লাভের কড়ি গুনতে শুরু করব।'

'তুই খুব আশাবাদী ও ধার্মিক বুঝলাম। কিন্তু এখানে আসিস তো সপ্তাহে দু-দিন কী তিনদিন। কোটি টাকার মাল। সামলায়টা কে?'

'ওই— ওই যে আমার বিশ্বস্ত শিরোমণি। একাধারে শিল্পী, ডিজাইনার, অন্যদিকে বিশ্বস্ত কর্মচারী।'

আব্বাস যার দিকে আঙুল তুলল, তার দেহ ও অভিব্যক্তিতে কিছু ব্যতিক্রম আছে। সে খুব লম্বা, দৈহিক কাঠামোয় মেদ-মজ্জা কম, তামাটে রঙ, মাথার পাতলা চুলে কিন্তু রঙ মাখার চিহ্ন, চোখ কুঁচকে থাকে, দেখলে মনে হবে ভাবনায় ভারাক্রান্ত। ধারেপাশে নজর কম, ছিমছাম পরিবেশে শিল্পকর্মে মগ্ন থাকাতেই হয়তো অভ্যস্ত। বাড়তি কথায় নেই, উঠে দাঁড়ায়, সামান্য সৌজন্য দেখিয়ে হাত তোলে কপালে।

আব্বাসউদ্দিনের কিন্তু লম্বা গুণকীর্তন, 'রামপ্রসাদ কর্মকার। জাত স্বর্ণ শিল্পী। নিত্য নতুন ডিজাইনের জন্ম দেয়। সততার সঙ্গে কাজ করে। কূট-কাচালিতে থাকে না। এখানকারই লোক। এ জেম অফ সাগর-সোসাইটি।'

মালিকের ইশারার অপেক্ষা না করেই রামপ্রসাদ কোনও একটা স্টল থেকে চা ও বিস্কুট নিয়ে এলো। বোঝা গেল, মালিকের উপস্থিতিতেও ক্যাশবাক্সে তার অবাধ প্রবেশাধিকার। ক্যাশ থেকে একমুঠো টাকা নিজের পকেটে চালান দিয়ে দীপকে নিয়ে আবার পথে নামে আব্বাস। আরও খানিক এগিয়ে যাবার পর পশ্চিমে বাঁক নেয়। তারপরই আব্বাসের ছবির মতো 'সাগরনিবাস'। নাতিবৃহৎ একতলা হলেও নয়নাভিরাম। সামনে চিলতে বাগান। পিছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পানের চাষ। সেখানে আবার একটি ছোট্ট চালাঘর। আব্বাস আঙুল তুলে বললে, 'ওটা হালিমার সংসার। সব দেখাশোনা করে এখানকার। প্রয়োজনে ডাকবি, যা দরকার। ব্যবস্থা করে দেবে মেয়েটা। আশঙ্কার কারণ নেই। আমি ওকে বলে দিয়ে যাবো।'

দীপের পিঠে বন্ধুর মৃদু করাঘাত।

দীপের জন্য যে ঘরখানা খুলে দেওয়া হলো, সেটা যেন এক শেখের বিলাসবহুল তাঁবু। দেওয়ালে ঝুলন্ত চাঁদ-তারা সমেত মক্কার মসজিদ, মস্ত সোফা, যৎপরোনাস্তি সুখদায়ী শয্যা, অ্যাটাচ বাথ ও টয়লেট, ছবিতে আব্বাজানের হাত ধরে বালক আব্বাস, ফ্ল্যাট টিভি, দেওয়ালে এ-সি মেশিন, ঝুলছে সিলিং ফ্যান। পরিবেশে আরও মাধুর্য আনে বাইরে রকমারি পাখির ডাক। দীপ কম-বেশি মুগ্ধ। কৃতজ্ঞও। আব্বাস হাত বাড়ায়, 'হ্যাভ এ পিসফুল অ্যান্ড ড্রিমফুল হ্যাপি নাইট। আমাকে এখুনি যেতে হবে। না হলে লাস্ট লঞ্চ ধরতে পারব না।'

দীপ তার শিক্ষানবিশি পর্বেই তালিম পেয়েছে, কীভাবে নিজেকে কিছুটা আড়ালে রেখেও কেজো পৃথিবীর অপরিচিত ভূখণ্ডকেও আনন্দলাভের ছোট ছোট মুহূর্ত গড়ে নেওয়া যায়। বিড়ম্বনার মধ্যেও থাকতে পারে সাফল্যের বীজ; তবে বাগাড়ম্বর অবশ্যই একটি বদ দোষ— যা দীপ পাণিগ্রাহী এখনও ঠিক ত্যাগ করতে পারেনি।

ব্রাঞ্চ ইন্সপেকশনে যাওয়া মানেই নিজের ওপর একটা শক্ত আবরণ রাখা। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সমেত সকলেই সতত ব্যস্ত তাঁর ব্যক্তিগত তুষ্টিকে সার্থক করতে। এবিষয়ে নাগরিক চেতনার সঙ্গে মফস্‌সল, এমনকী গ্রামেরও দৃষ্টিভঙ্গির কোনও প্রভেদ নেই। তাই যার ছুঁৎমার্গ নেই, তাকে এই কাজে না রাখাটাই বিধেয়। ইন্সপেক্টররা যদি তাঁদের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতো, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীরা এভাবে জাত অপরাধীর শিরোপা আদায়ে সমর্থ হতো না। মিডিয়াও এভাবে সাড়া তোলার বহু আগেই একাধিক জনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হতো।

দীপ পাণিগ্রাহী তাই সুবিধা নেবার প্রলোভন থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা বরাবর করে এসেছে। কিন্তু এই প্রথম সে নিজের ওপর বিরক্ত। তবে কী উচিত হয়েছে আব্বাসের বাগানবাড়িতে বিনে পয়সায় তিনটি রাত কাটাতে সম্মত হওয়া? হতে পারে আব্বাস তার কলেজ জীবনের বন্ধু, কিন্তু সে তো আবার ব্যাঙ্কের ভ্যালুড কাস্টোমার! তাহলে?

দীপ ভাবে কাজের দুনিয়ায় সে যথাসাধ্য কঠিন, কিছুটা

KALI PIGMENTS PVT. LTD.

Manufacturers of Red Lead, Litharge & Lead Sub-Oxide

1/4C, Khagendra Chatterjee Road
Kolkata - 700 002, W.B. India
Mobile : 98367 98663, Email : rinku_kej@yahoo.com
E-mail : kamal.kishore64@yahoo.com

D. S. ENGINEERS & CONSULTANTS
73, Bentick Street, 1st Floor, Kolkata - 700 001
M : 9331741971, Ph, - 033 40648081,
www.silverlinetyres.com e-mail : sdhanania@gmail.com

CYCLE & VAN
TYRES TUBES & RIMS

অসামাজিকও। কারোর বাড়িয়ে দেওয়া প্যাকেট থেকে সিগারেট নেয় না। দামি ওয়াইনের ব্যবস্থাপনা দেখলে হামলে পড়ে না। তবে একটু পেটুক। বিশেষত, এক-আধটা মিষ্টি পেলে হাত গুটাতে পারে না। যেমন তার রমণীপ্রীতিও লক্ষণীয়। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলায় উৎসাহ। হয়তো এটা তার ব্যর্থ প্রেমের প্রতিক্রিয়া। যেন সে তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকা বিদ্যাশ্রী পট্টাভিরমণকে ঈর্ষাকাতর করতে চাইছে। একসঙ্গে ব্যাঙ্কে অফিসার হয়ে ঢুকেছিল। প্রেম হয়েছিল। পরে সেই দক্ষিণী কন্যা জনৈক প্রবাসী ডাক্তারের ঘরনি হয়ে চাকরি ছেড়ে সেই যে পাড়ি দিল লন্ডনে, আর ফিরে আসেনি। দীপ ভোলেনি। ব্যথাটা থেকে থেকে ফিরে আসে।

কপাটে তালা ঝুলিয়ে পথে নামে। আগে যাবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। তারপর কপিলমুনির আশ্রম। তারপর সোজা সমুদ্রতট। ফিরে এসে বসবে ল্যাপটপ নিয়ে। কিছু ইনফরমেশনকে ট্রান্সমিট করা আবশ্যক।

অনেকখানি পথ পায়ে হাঁটল সে। যা দেখছে, সবই অনেকদিন স্মৃতির ফোকাসে থাকবে। গুটিকয়েক ছবিও তোলে মোবাইল ক্যামেরায়। শেষমেশ উঠে বসে একটি রিক্সাভ্যানে। ভ্যান অতিক্রম করছে কালীবাজার। এখানেও ব্যাঙ্কের একটি মিনি ব্রাঞ্চ আছে। গুছাইত এতক্ষণে নিশ্চয় কাকদ্বীপে ফিরে গেছে। কাল বেলা দশটার আগে ফিরে আসবে।

এখন অবধি মনে হচ্ছে এ ব্রাঞ্চে জটিলতা কম। ভালো রেটিং তার কাছ থেকে পেতেই পারে। ভ্রূকুটির কারণ একমাত্র ওই গুচ্ছের গোল্ড লোন— তিরানব্বুইটা গোল্ড লোন আড়াই মাসে! এক একটা লোন অ্যামাউন্ট মিনিমাম পঁচাশি হাজার, ম্যাক্সিমাম তিন লাখ! সাগর দ্বীপে সোনার খনি!

যেহেতু একটা লোনেরও বয়স তিন মাস পার হয়নি, সুদ বা ইন্সটলমেন্টের প্রশ্নও ওঠে না। লোন নিল কারা? সকলেই কি এই দ্বীপের বাসিন্দা? সবকটাকে খুঁটিয়ে দেখতে বদ্ধপরিকর দীপ।

আবার সবকটা অলঙ্কারের পিউরুটি নাকি ভেরিফাই করেছে আব্বাসের কর্মচারী রামপ্রসাদ কর্মকার। আব্বাসের নামটা না জড়ানো থাকলেই ভালো হয়। ক্যাশ অফিসার আবার ওর দোস্ত। অস্বস্তি বাড়ছে।

প্রায় হাঁটি হাঁটি পায়ে সিংহদুয়ার দিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে প্রবেশ করে দীপ। কয়েকজন মহারাজকে ঘিরে স্নিগ্ধতা ও ব্যস্ততা। স্বামী প্রণবানন্দজীর মর্মর মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা জানায় দীপ। হুন্ডিতে পাঁচশো টাকার একটি নোট গুঁজে দেয়। প্রসাদ ও আশীর্বাদি ফুল নিয়ে ফিরে আসে।

পরবর্তী গন্তব্য কপিলমুনির মন্দির। এই প্রথম দীপ

এখানে এসেছে। এখন আরতির সময়। জমায়েত নামমাত্র। মুনিকে প্রণাম জানিয়ে চলল সে এবার অদূরবর্তী সমুদ্রে। এখন সাগরের চিত্ত প্রশান্ত। আধখানা চাঁদের আলো নোনা জলে ঝিকিমিকি। অনেক দূরে ফুটকি ফুটকি আলো— সম্ভবত কোনও জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে খানিক সমুদ্রের জল তুলে নিজের মাথা ভেজায় দীপ।

সব মিলিয়ে খুশি দীপ। কাছাকাছি একটি হোটেলে ঢুকে রুটি তরকারি ডিমের কারি দিয়ে রাতের আহার সেরে নিল। তারপর একটা সিগারেট ধরায়। সারা দিনে সে তিনটির বেশি সিগারেট খায় না। এটা তার দ্বিতীয়।

একটা ট্রেকার আসছে। হাত তুলে দীপ ওটাকে থামায়।

পাখিরা পোকারা একচোট বাকবিতণ্ডা চালিয়ে সকলে হঠাৎই নিশ্চুপ। নির্জনতা ঘন হয়। অথচ ল্যাপটপ খুললেও কাজ ততটা এগোয়নি। টিভির দিকে তাকানো মানে মনের বিতৃষ্ণাকে দ্বিগুণ করা। এ রাজ্যের খবর এখন দ্বি-বিধ— প্রথমত, পঞ্চায়েতের ভোট নিয়ে যদুবংশের চেলারা যে হারে প্রায় অবাধে হিংস্রতা চালাচ্ছে, তাতে গণতন্ত্রের শ্মশানযাত্রা। দ্বিতীয়ত, এখানে-ওখানে নারী নির্যাতন সমেত এমন সমস্ত অপরাধ ও কেচ্ছা যে মধ্যবিত্তের হাত-পা সমেত গোটা শরীর কেমন শিথিল হয়ে আসে।

আগামীকাল তার জন্য কী কী বরাদ্দ রয়েছে, ভাবতে ভাবতে আয়নার সামনে দাঁড়ায় দীপ। চোখের চাউনিতে টুকরো টুকরো ভাব এনে মজা পায়। কাজ ও কর্তব্যের মোড়কে ঢাকা এই মানুষটার মন সময় সময় যে কীরকম করে ওঠে, কেউ তার হদিশ রাখে না।

রাতের বয়স এমন কিছু নয়। চারদিকে মধ্যরাতের শুনশান পরিবেশ। অচেনা আবহ। ঠিক এই সময়ে একটি নারীমূর্তি দীপের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে সন্তর্পণে। ছন্দবদ্ধভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে তার কোমর এমনভাবে দোলে যেন একটি রিভলভিং চেয়ারের সিকিভাগ পরিক্রমা, ঠিক বুঝি চৌথুপি বাক্সের বিজ্ঞাপনে শরীর দেখানো এক বনলতা সেন। দর্শকের বোধবুদ্ধি বিবেচনা শক্তিকে চিবিয়ে খাবার জন্য কোম্পানির কার্যকরী আয়ুধ।

দরজায় টোকা দেবার আগে সে মনে মনে কী যেন হিসেব করে। তারপর —। তারপর টোকার শব্দ পেয়ে দীপ দরজা খোলে। একেবারে মুখোমুখি। বিস্ময়ের খপ্পরে পড়ে দীপ কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকে। এরপর প্রশ্ন করে, 'তুমি?'

উত্তর এল সুরেলা গলায় হেঁয়ালি না রেখে, 'আমি হালিমা খাতুন। মনিব ফোনে আপনার কথা বললেন। আপনার যা যা দরকার, সব আমাকে বলতে পারেন। রাত তো হয়েছে। যদি বলেন, কাছাকাছি হোটেল থেকে খানা এনে দিতে পারি।'

'আমি খেয়ে এসেছি। তুমি বরং টেবিলের ওপর এক গেলাস জল ঢাকা দিয়ে রেখে যাও।'

এবার হালিমার কিন্তু হরিণগতি। দশ গোনার মধ্যে নিজের চালাঘর থেকে জলভর্তি একটি কাচের জগ এনে রাখল টেবিলের ওপর। জগটা ঢেকে রেখে সে ঘুরে তাকায় দীপের মুখের দিকে। মুখে সেই দুর্জ্ঞেয় হাসি, দেহে সেই সমস্ত বিভঙ্গ— যারা ফন্দি-ফিকির খোঁজে এবং পেয়েও যায় বহাল তবিয়তে। এক ধরনের গ্যাসচেম্বার। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবার কৌশল করায়ত্ত। তারপর মুরগিটার যে কী দশা হতে পারে, ঈশ্বর জানেন। মুহূর্তে দুঁদে ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহীর মনে কতগুলি প্রশ্ন কিলবিলিয়ে ওঠে। এই বস্তু কি আব্বাসউদ্দিনের পোষা জীব— যাকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করা যায়, নাকি ওই চালাঘরে ওর নিজস্ব মরদও থাকে! গোটা বাগানের পরিচর্যা কি এই সুন্দরীর পক্ষে সম্ভব? রাতে বনবাসিনীর অমন রূপচর্চা! চোখে সুর্মা, ঠোঁটে রং, মুখে পাউডার, পরনে ঝিলিক শাড়ি!

কৌতূহলে আধিক্য থাকলেও দীপ নিজেকে সংযত করে রাখে, 'হালিমা তুমি এখন আসতে পারো। দরকার হলে ডাকবো।'

ফ্লুরোসেন্ট আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে হাল্কা আলোয় ফিরে যায় হালিমা। দীপের অনুসরণকারী দৃষ্টি পলকহীন অবস্থায় থাকে প্রায় মিনিটখানেক।

আজকের আব্বাস সম্পর্কে দীপ একেবারে অনবহিত। হারেমে দুই বিবি, দশটি সন্তান। আবার তার রুদ্রনগরের বাগানবাড়িতে অমন এক খুবসুরত পরিচারিকা! আব্বাসের পিছুটানটা কোন দিকে? নিভাঁজ সুন্দর শয্যায় নিজেকে সঁপে দেয় দীপ। যেন আল্পসের চূড়া থেকে অবসাদ নেমে আসছে। তবুও শয়নমাত্রই নিদ্রাকবলিত হতে পারে না সে। হালকা ঘুমে স্বপ্ন এলো। সেই তার দক্ষিণী প্রেমিকা বিদ্যাশ্রী। দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটছে কোভালম সি বিচ ধরে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। কিন্তু হু-হু বাতাস। হঠাৎ সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় বিদ্যা। পিছনে ফিরেও তাকায় না। মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে সমুদ্রে বিন্দুটি হয়ে। ঘুমের মধ্যে কঁকিয়ে ওঠে দীপ।

সেই যে ঘুম ভাঙলো, আর দু-চোখের পাতা এক হলো

না। নিরালম্ব শূন্যতায় কিছুক্ষণ ভাসমান থাকে দীপ। তারপরই কানে আসে রিন্ রিন্ হাসির আওয়াজ। বরাবরই গোয়েন্দাসুলভ কৌতূহল তার। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জানালার পর্দা সরিয়ে পশ্চিমদিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। আধখানা চাঁদের আলোও এখন যথেষ্ট জোরালো। দীপ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এক উত্তেজক লুকোচুরি খেলা। শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজ পরে হালিমা খাতুন পানবনের এ কোণ থেকে সে-কোণ ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর তাকে নাগালের মধ্যে পাবার জন্য দীর্ঘদেহী এক পুরুষও ছুটছে তার পিছু পিছু। লুঙ্গি হাঁটুর ওপর গোটানো, চুল এলোমেলো, একবার চশমাটার প্রায় স্থানচ্যুত হবার অবস্থা। লম্বা দুই হাত সমানে বাতাস কাটে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দীপ উচ্চারণ করে, 'রামপ্রসাদ কর্মকার।' সাগরে আব্বাসের ডান হাত।

শেষমেষ হালিমা স্বেচ্ছায় ধরা দেয়।

কর্মকার তাকে দুহাতে তুলে ধরে সোহাগে গদগদ। চালঘরের দুর্বল কপাটটাকে একরকম লাথি মেরে খোলে। ভেতরে ঢোকে দু'জনে।

গ্রাহক পরিষেবা শুরু হতে তখনও কম করে পনেরো-কুড়ি মিনিট বাকি রয়েছে। দীপ পাণিগ্রাহীর পিঠের ওপরে সেটে থাকা ব্যাগটা আজ কিন্তু ফেঁপে ফুলে আছে। কারণ, আজই প্রথম বেলার ঠা ঠা রোদে দাঁড়িয়ে হকারদের কাছ থেকে বেশ কয়েকখানা বাংলা সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কিনে ব্যাগে ঠেসেছে। পরে নিশ্চিন্ত মনে পড়া যাবে। কাছাকাছি কোনও এক অনুষ্ঠান থেকে মাইকে ভেসে আসছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বাংলা গান খুব পছন্দ দীপের। সুযোগ ও সময় পেলে এরকম প্রোগ্রামে যেতে সে এক পায়ে খাড়া।

পৌনে দশটায় ব্রাঞ্চে ঢুকেছিল দীপ। আর এখন তার কালো ডায়ালের রেডিয়াম ঘড়িতে প্রায় বিকেল পাঁচটা। সারাটা দিন ভল্টের মধ্যে দীপ যেন ঝড়ের আবহ তুলেছিল। তার মগজের গঠন যে অতটা ঋজু হতে পারে, এরা নিশ্চয় বুঝে উঠতে পারেনি। একদম বাতেলা নয়, কথা যা বলেছে তার আশি শতাংশ ইংরেজি। আর সব কটা ব্যাখ্যাই সোজা ঢুকে গেছে Banking Regulation Acts এবং Book of Instructions এ। যার বা যাদের উদ্দেশ্যে বলা, তারা তো ভড়কে যাবেই। ভল্টের মধ্যে একটা বড় টেবিলের তিনদিকে তিনজন। ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহী, হেড খাজাঞ্চি সুশীল চক্রবর্তী, কাকদ্বীপ ব্রাঞ্চ থেকে আসা ডেপুটেড ক্লার্ক-কাম-ক্যাশিয়ার হরেন গুছাইত। দীপকে বাদ দিলে বাকি দু'জন হতভম্ব। এখনও টেবিলের ওপর গোল্ড লোনের ডকুমেন্টগুলি যে অবস্থায় রয়েছে, তা যেন এক পাড়-ভাঙা নদী— অপরাধীরা বাস্তবিকই সেখানে হাবুডুবু খেতে বাধ্য। তিরানব্বুইটা গোল্ড লোনের প্রতিটি অলঙ্কারের ওজন দীপ নিজের হাতে নির্ণয় করেছে। অদ্ভুত এক দৃষ্টান্ত— প্রতিটি গহনা মিনে করা বালা। যেন একই পরিবার থেকে এসেছে তারা। যেন একটিমাত্র পরিবারের তিরানব্বুই জন সদস্য সদস্যা এসে সোনা বন্ধক রেখে মোটা টাকার ঋণ নিয়ে গেছে। বিরলদের মধ্যে এটা হল এক নম্বর বিরল দৃষ্টান্ত।

এক বালতি জল আনিয়ে পেতলের পাল্লায় প্রতিটি বালাকে সুতো দিয়ে বেঁধে ওজন কষেছে দীপ নিজের হাতে, কারোর সাহায্য না নিয়ে। উত্তেজনায় তার দুই চোখ জ্বলছিল। ওয়াটার ওয়েটের এই থিওরির জনক সেই আদি সুসভ্য দেশ গ্রিসের মহাবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস। ইউরেকা, ইউরেকা, ইউরেকা। Wax and water have the same specific gravity। প্রত্যেকটি ওজনে বিস্তর গলতি ধরা পড়ে। তৃতীয় বিরল নির্ণয় হল, একটা বালাতেও নির্ভেজাল সোনার অস্তিত্ব নেই। নিজের ব্যাগ থেকে একটা বড়সড় টাচস্টোন অর্থাৎ কষ্টিপাথর বের করে দীপ। তখন তার চোখে-মুখে ভরভরন্ত আদিম হিংস্রতা। একটা একটা করে বালা ওই পাথরে ঘঁষলো। তামাটে দাগ ফুটে ওঠে পাথরে। সেই দাগের ওপর সামান্য কার্বোলিক অ্যাসিড ঢালে দীপ। মুহূর্তে প্রতিটি দাগ মুছে যায়। ধোঁয়ার রেখাগুলি এঁকেবেঁকে ঘুরতে থাকে তিন কুশীলবকে ঘিরে। দীপকে তখন মনে হচ্ছে যেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবিষ্ট লক্ষ্মণ। মেঘনাদ বধে বদ্ধপরিকর। একবার কেবল উচ্চারণ করে, 'ঈশ্বর! একটা বালাও সোনার নয়। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

এরপর ডকুমেন্টস্।

কী অদ্ভুত! তিরানব্বুই জন লোনিকেই লোন ডকুমেন্টে ইন্ট্রডিউস করে দিয়েছেন একজনই মহামানব। তিনি জনাব আব্বাসউদ্দিন মণ্ডল। এবং তিরানব্বুই জন লোনির মধ্যে একজনও হিন্দু নেই। সব ক'জনই ইসলামে আশ্রিত। দীপ বাজি ধরে বলতে পারে, এই সবকটা নাম ও তাদের পরিচিতি ফিকটিসাস। ব্যাঙ্ক নিশ্চয় পরে এই সত্যটাকেও টেনে বের করবে।

এরপর পিউরুটি ভেরিফিকেশনের প্রসঙ্গ। প্রতিটি লোনের অলঙ্কারকে খাঁটি সোনা হিসেবে সার্টিফিকেট করেছে

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.

'NAVEEN' brand tiles

REGENCY CERAMICES LTD.

BELLS CERAMICES LTD.

ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"

24, Park Street,

Kolkata - 700016

Phone :2229-8411/1031/4352

Fax : 91 33 2229-0492

e-mail : wadhwana@vsnl.com

বাবু রামপ্রসাদ কর্মকার। সে কে? সে আব্বাসের জুয়েলারি শপের ম্যানেজার। তার নর্মসহচরী— না থাক, সেই বৃত্তান্ত একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। ...আমি এবার যাবতীয় তথ্য ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে জানিয়ে সোজা ছুটবো লোক্যাল হেড অফিসে। পুলিশ আসবে, দারোগা আসবে, আসবে ব্যাঙ্কের ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের দক্ষ আধিকারিক। মিডিয়াও ঠিক গন্ধ পেয়ে যাবে। বিখ্যাত হয়ে উঠবে ব্যাঙ্কের রুদ্রনগর শাখা। ফোকাস এসে পড়বে তিন ব্যক্তিত্বের উপর— ধনী ব্যবসায়ী জনাব আব্বাসউদ্দিন মণ্ডল, হেড ক্যাশিয়ার বাবু সুশীল চক্রবর্তী, অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ বিশেষজ্ঞ বাবু রামপ্রসাদ কর্মকার। তবে শপথ নিয়ে বলছি, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমার নামকে আড়ালেই রাখতে। বিড় বিড় করতে করতে হরেন গুছাইতের সাহায্যে গোল্ড লোনের ব্যাগ ও ডকুমেন্টগুলিকে দুটো আলমারিতে ঢুকিয়ে সিল করে দিল দীপ।

সুশীল চক্রবর্তী কিন্তু ঠাঁয় বসে আছে। একদম পাথরের মূর্তি। অন্যমনস্ক মানুষও অতটা নিথর হয় না। অবশ্য দেশের ব্যাঙ্কিং ফিল্ডে এরকম পাথুরে ব্যক্তিত্বদের সংখ্যা বাড়ছে। একজনকেও কিন্তু একাকিত্বের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। শাখা-প্রশাখায় এরা ক্রমে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে। এখনও সময় আছে, অঙ্কুরে এদের চিহ্নিত করতে না পারলে সর্বনাশ আগামী প্রজন্মের।

দীপ আলমারি দুটো বন্ধ করে সুশীল চক্রবর্তীর ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কত টাকায় রফা হয়েছিল, সুশীলবাবু? এখনও তো আপনার প্রায় আড়াই বছর চাকরি বাকি ছিল। এত বছর সুনামের সঙ্গে চাকরি করার পর এরকম পদস্খলন! আব্বাসের টাকা আছে। অনেক বছর দরে আইনি লড়াই করবে। আপনি? আপনার কী হবে? নিন, উঠুন, আমিই এখন নিজের হাতে ভল্ট বন্ধ করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে চাবিগুলি দিয়ে যাবে গুছাইতকে সাক্ষী রেখে। আপনি তখন বলা বাহুল্য আপনার গডফাদারকে সবিস্তারে সব জানাবেন।'

হরেন গুছাইতের কাঁধে হাত রেখে শাখা প্রবন্ধকের ঘরে প্রবেশ করল দীপ পাণিগ্রাহী

পড়তি বেলার লঞ্চে ভিড় একটু বেশি। লঞ্চে ওঠার আগে সিগারেট ধরিয়েছিল দীপ। তিন নম্বর সিগারেট অর্থাৎ আজকের কোটা শেষ। দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করতে পারলে এই মায়াবী নেশাটাকেও ত্যাগ করতে হবে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে পিছনে ফেলে জলযানে উঠে পড়ে সে এবং আজও একটা পছন্দসই জায়গা পেয়ে গেল। হেড অফিসকে অনুরোধ করেছে গাড়ি না পাঠাতে। এখন আবার মোবাইলটাকে জীবিত অবস্থায় আনে। তার বিশ্বাস, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এর রিংটোন বেজে উঠবে। নদীর বাতাসে আজ বড় কমনীয়তা। একা থাকার স্বাধীনতাকে আনন্দের সঙ্গে অনেক বছর সে উপভোগ করেছে। আর নয়। বয়স অনেক হলেও হয়তো এখনও পারিবারিক স্পেসে নিজের ঠাঁই গড়ে নিতে পারবে।

আসবার সময় সে বাড়ির চাবি দিতে গিয়েছিল হালিমার চালাঘরে। অস্বচ্ছ গুহা থেকে যেন বেরিয়ে এলো মনোহারিণী। পুনরায় বেশ পরিবর্তন। সাদা নাইটি, লম্বা স্লিম, বাঁকা বিনুনি, মদালসার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এবারও বিপদ এড়াতে পেরেছে দীপ।

'চাবিটা দিয়ে গেলাম। তোমার মনিবকে জানিও। আমি আর এখানে থাকছি না।'

অনুমান অভ্রান্ত। মোবাইলটা বেজে ওঠে।

'হ্যালো।'

'আমি আব্বাস বলছি।'

'বেশ।'

'সব শুনলাম।'

'তাহলে আর বেশি কথার দরকার নেই। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল।'

'তুই এখন কোথায়?'

'মাঝ নদীতে।'

'যাচ্ছিস কোথায়?'

'আমাদের হেড অফিসে।'

'হেড অফিস না গিয়ে আমার বড়বাজারের দোকানে চলে আয়, বুড়বক।'

'কোন দুঃখে?'

'দু-পকেট ভরতি টাকা। রাতে হালিমা।'

'বাহ্! আর কিছু হবে না?'

'আয়, মুখোমুখি কথা হবে।'

'দেখ, বাংলা ভাষাটা আমি খুব ভালো জানি না। তবে সেখানে শবরীর প্রতীক্ষা বলে একটা কথা আছে। তুই মাইরি শবরীর ওই প্রতীক্ষার নতুন নজির হয়ে থাক।'

'তোর এ তেজ থাকবে না। তোকে ঘায়েল করার অস্ত্র হতে পারে ওই হালিমাই।'

'সে গুড়েও বালি। আমি রুদ্রনগর থানায় আগাম যা জানাবার, জানিয়ে এসেছি।'

'থানা! হাসালি। থানা আমার পকেটে।'

'ওই পকেট খালি হয়ে যাবে রে। ফর ইওর ইনফরমেশন, সরকারি গোয়েন্দা দপ্তরের শীর্ষে আসীন এখন অনুত্তম চৌধুরী। নাম শুনেছিস? চৌধুরীদা আমাকে স্নেহ করেন। সব সংক্ষেপে শুনেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মুহূর্ত গুনে যা।'

'শা—'

মোবাইলের সুইচ অফ করে দীপ।

লঞ্চ লট নং এইটের জেটিতে ভিড়ছে।

With Best Compliments From-

A Well Wisher

রেনেসাঁর ভূমিতে

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

Don't tell me, how educated you are, tell me how much you have travelled.

– Confucious

ক'বছর আগে কলকাতা বইমেলার ফোকাল থিম হয়েছিল ইতালি। সে দেশের প্যাভিলিয়নের বুকলেট পেয়ে মনে হল, আর বিলম্ব নয়। জুৎসই সঙ্গী আর মনের মত বিমান সংস্থার সন্ধানে যখন দিন কাটছে ঠিক তখনই সমাপতনের মত ঘটে গেল দুই যুবকের একই দিনে আগমন। শিলিগুড়ির শিক্ষক রাজীব ঘোষ রায় ও বন্ধুপুত্র বার্লিনবাসী তমোনাশ পাল। প্রথমজন এয়ার ইন্ডিয়ার সুলভ টিকিট ও দ্বিতীয়জন আমাদের নির্ঘণ্ট মেনে প্রতিটি শহরের ডেরা ও ট্রেন টিকিটের ব্যবস্থা করার কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করল। কলকাতায় তখন গ্রীষ্ম মধ্যগগনে। ইউরোপে Shoulder Season.

মিউনিখ থেকে পাদুয়ায় পৌঁছলাম দুপুর বারোটায়। স্টেশন থেকে বাইরে এসে দেখি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। নির্জন রাজপথে ট্রামলাইনে স্থানে স্থানে জল জমে। স্টেশনের স্থাপত্যে অনাড়ম্বর করিন্থিয়ম শৈলীর মধ্যে প্রাচীনত্বের ছোঁয়া। মধ্যাহ্নের পাদুয়া। কেমন ঝিমধরা ভাব। লোকজন গাড়িঘোড়া তেমন নেই – কেবল কিছু আফ্রিকান তরুণ ভবঘুরের মত ইতস্তত দলবদ্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতালি সম্পর্কে নানা কথা শোনা। ফলে সতর্কতার মাত্রা বাড়ে। স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তে প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে ওভারব্রিজ টপকে উত্তর প্রান্তে এসে একই রকম জনবিরল পল্লীতে বাগানে সাজানো হস্টেল বি. বি. উইলিয়ম। বেল বাজাতে এসে গেট খুলল মালকিন চীনা তরুণী।

প্রাগ বা মিউনিখের তুলনায় শ্রীহীন ছোট ঘরটি আমাদের দেশের যে কোনও তীর্থস্থানের দু'কামরার ধর্মশালার সমগোত্রীয় বলা যায়। তবে ড্রইং কাম ডাইনিং রুমটি স্মারকে আসবাবে ও সৌন্দর্যে নজরকাড়া।

পাদুয়ায় পদার্পণ করে সর্বত্র এক পল্লী প্রকৃতির ছোঁয়া অনুভব করছি। এক নির্ভেজাল গ্রাম্য পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে অমলিন এই ঐতিহাসিক নগরী। আজও সে সেক্সপিয়র বর্ণিত প্লেসেন্ট গার্ডেন। নিজের দেশে চেনা শহরতলী এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ডাহুক ডাকা বাগান, বেনেবৌ এর ডাক, পুষ্করিণীতে পানকৌড়ির ডুব বা কালো হয়ে আসা দিঘীর জল দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে আগ্রাসী নগরায়নের দাপটে। সেখানে পাদুয়ার মত শহর যেন কষ্ট কল্পনা। আজও সে মধ্যযুগের প্রকৃতিকে ধরে রেখেছে।

গেটস্ অব প্যারাডাইস, ডুয়োমো, ফ্লোরেন্স।

অজানা অচেনা শহরে মুক্ত ভেলার মত ভ্রমণের মজাই আলাদা। ভারতীয় রেস্টুরেন্টে মেনুর দাম দেখে বেরিয়ে হঠাৎ এক বাঙালি শেফকে আবিষ্কার করি। মাথায় ছোট, বহরে বড় বাঙালি সন্তান চিনতে আমার কখনোই ভুল হয় না। ছেলেটি বাংলাদেশের বাঙালি। নিজেই প্রস্তাব দিল এবং পরিবেশন করল চিকেন কাবাব পিৎজা। দাম, মান ও পরিমাণ সবকিছুই পরম তৃপ্তিদায়ক।

ভ্রমণ সূচি বানাবার সময় পাদুয়া শহর নির্বাচনের পিছনে একটাই যুক্তি ছিল, কাছাকাছি অন্য শহরে থেকে ভেনিস দর্শন। সুতরাং ২৪ মাইল দূরে পাদুয়াই ভালো। এ শহরে এসে বোঝা গেল গুপ্ত যোগীর মত পর্যটনের আলোকবৃত্তের বাইরে থাকা পাদুয়াকে দর্শন না করলে কালচারাল ট্যুরিস্ট হিসেবে নিজেকে ভেবে নেওয়া শ্লাঘাটা অবশ্যই ধাক্কা খেত।

লে মার্কেভেনাসি, পিয়াৎসি গ্যারিবল্ডি, পিয়াৎসি কাভুর একের পর এক পেরিয়ে চলি। স্কুল জীবনের পাঠ্যে এই নামগুলির সঙ্গে নামমাত্র পরিচয় হয়েছিল। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির শিকার হই, যেমনটি হয়েছিলাম কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে। এই পথেই একদিন হেঁটেছিলেন কোপার্নিকাস, যেখানে আমি আজ দাঁড়িয়ে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতালির দ্বিতীয় ও বিশ্বে ষষ্ঠ প্রাচীনতম একথা জানা ছিল। এখানে ১৫৯২তে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন গ্যালেলিও, ছাত্র হিসেবে গৌরবময় উপস্থিতি ঘটেছিল কোপার্নিকাসের। বিশ্বে প্রথম মহিলা এখান থেকে ডিগ্রী

লাভ করে। ফ্যাব্রিসিয়াস বিশ্বের প্রথম অপারেশন থিয়েটার বানান। রক্ত সঞ্চালন তত্ত্বের উদ্ভাবক ইউলিয়ম হার্ভে থেকে স্তাঁধাল কতো প্রতিভা ধন্য করেছে এখানকার জ্ঞানপীঠকে।

পায়ে পায়ে এসে যাই জার্ডিনি ডেলোরিনা। এক টুকরো পারিজাত উদ্যান যেন। প্রাচীন রোমান এ্যাম্ফি থিয়েটারের কিছু চিহ্ন ছড়ানো ছিটোনো। এই উদ্যানই সম্প্রসারিত হয়েছে বিশ্বে প্রাচীনতম বটানিক্যাল গার্ডেনে।

অনেকের মতে পাদুয়ার ইতালিয়রাই নাকি সৌন্দর্যে সেরা। তার সঙ্গে মিশেছে অসম্ভব সাজানো গোছানো শহর। দু'ধারে পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকের চওড়া পাথরের পাঁচিলে গড়া বিল্ডিং, সেই সঙ্গে সযত্নে রাখা করিডোর, আর্কেড, কলাম, পথিক-বান্ধব ও সাইকেল ফ্রেন্ডলী কবল্ড রোড।

ভিয়া রোমায় এসে মনে হল আনন্দময় পায়ে চলা পথ এমনই হওয়া উচিত। কিছুটা উজিয়ে এসে যায় পালাজ্জো ডেল্লা রাগিওনি। ১২১৯ সালে বানানো স্তম্ভহীন এমন বিশাল কক্ষ ইউরোপে নাকি দ্বিতীয়টি নেই। পঞ্চদশ শতকে এর চার দেওয়াল তিনশোর বেশি ফ্রেস্কো দিয়ে সাজানো হয়েছে।

সমগ্র পাদুয়াই সন্ত অ্যান্থনিময়। পর্তুগালের লিসবনে জন্মানো এই মহাত্মা খ্রিস্টের প্রচারে এসে একাকার হয়ে গেছেন এই শহরের সাথে। কোন অতীতে ১২২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এক চার্চ ও সংলগ্ন কাম্পোনিল অভিভূত করে। সুউচ্চ টাওয়ারের শীর্ষে দণ্ডায়মান এ্যান্থনির মূর্তি যেন পড়ন্ত সূর্যের আলোয় স্নান করছে। দূর থেকে এই ব্যাসিলিকার বাইজান্টাইন স্থাপত্যের গোম্বুজকে প্রথমে মসজিদ বলে ভ্রম হয়েছিল।

পাদুয়ার মূল আকর্ষণ ১২৩১-এ নির্মিত বৃহৎ ব্যাসিলিকাটি। এটিও সন্ত এ্যান্থনির স্মৃতিতে নির্মিত। শত চার্চের প্রাগ দর্শনের পর দেখার দৃষ্টি ইতিমধ্যেই কিছুটা প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাই রোমানেস্ক, গথিক, বাইজান্টাইন, রেণেসাঁ ও বারোক স্থাপত্যের মিলিত সৌন্দর্য নতুনত্বের স্বাদে মুগ্ধ করল। পবিত্রতায় এই ব্যাসিলিকা খ্রিস্ট দুনিয়ায় জেরুজালেমের সমগোত্রীয়। গ্যেটের ফাউস্টে মার্থে যখন মেফিস্টোফিলিসের কাছে জানতে চেয়েছিল তার স্বামী কোথায় আছে মেফিস্টোফিলিস বলেছিল তিনি পাদুয়ায় সন্ত এ্যান্থনির কাছে এক পবিত্রস্থানে সমাধিস্থ রয়েছেন। এক অতিন্দ্রীয় অনুভূতির জন্যই বোধ হয় এই সব প্রার্থনাস্থলকে চার্জড প্লেস বলে।

সকালে ব্রেকফাস্টের আসরে আলাপ হল সিয়েনা থেকে আসা এক ইতালীয় কাপলের সাথে। আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় লুককার বদলে নিজেদের শহর সিয়েনায় যেতে অনুরোধ করে জানালো, প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্বাদ পেতে গেলে সিয়েনা যেতেই হবে। ওরাও ভেনিস যাবে। আহারান্তে বলল, 'ভেনিসে দেখা হবে।' অনেকটা ইহুদিদের বিদায় কালের সম্ভাষণ, নেক্সট ইয়ার ইন জেরুজালেম, এর মত শোনালো।

রামেশ্বরমের পথে সমান্তরাল বাসের ব্রিজকে সঙ্গী করে ট্রেন যেমন সমুদ্র সেতু অতিক্রম করে সেই ভাবে ভেনিসে ট্রেন ঢুকলো। স্টেশন থেকে বাইরে আসতেই যেন অপেক্ষমাণ গ্র্যান্ড ক্যানেল করমর্দন করে বললো 'ওয়েলকাম টু ভেনিস'।

মধ্যযুগে রেশম সড়কের শুরু এই ভেনিস থেকে, শেষ বলা হয় চট্টগ্রামে। মধ্যিখানে যোজকের কাজ করেছে বিশাল চীন। বাংলার মসলিন বাগদাদ চীন হয়ে রোমে পৌঁছত এই ভেনিস হয়ে। ষোড়শ শতকে বিশ্বের এক নম্বর নগরীর মর্যাদার শিরোপা পেয়েছিল এই ভেনিস। আজকের ভেনিস কেবলই ট্যুরিস্টের নগরী। ৫৫০০০ স্থায়ী বাসিন্দার ভেনিসে দৈনিক ৬০০০০ পর্যটক সমাগম হয়। তাই স্থানীয় পৌর প্রশাসন যার পর নাই চিন্তিত। মেয়র লুইগিব্রুগনারো পর্যটকের সংখ্যায় রাশ টানতে চাইছেন। ইতিমধ্যেই বাড়ি বা দোকানঘরের হাত বদলে নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছে। শব্দদূষণ কমাতে কবল্ড রোডে হুইল্ড লাগেজ নিষিদ্ধ। ভেনিসে অটোমোবাইল নেই। ভেনিস নাকি প্রতিবছর কয়েক সেন্টিমিটার বসে যাচ্ছে। একশো সতেরো ছোট বড় দ্বীপ সমন্বয়ে গড়া ভেনিসে নিকাশী ব্যবস্থাও তেমন নেই। সব বর্জ্যর গন্তব্য এই এ্যাড্রিয়াটিক।

এত কিছু সত্বেও এ্যানিগম্যাটিক ভেনিস আজও একটা মিথ। বিশ্বের মোস্ট রোমান্টিক ডেস্টিনেশন। পর্যটকের সংখ্যা অন্তত সে কথাই বলবে। গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারেই দু'হাত দিয়ে ধরে রাখা এক মস্ত গৃহ-র অলঙ্করণ চোখে পড়ার মত। হাতে ম্যাপ নেই। উদ্দেশ্যহীন জিপসীর মত 'ফলো দ্য মব' আপ্তবাক্যটা মেনে ব্রিজ অতিক্রম করে ঢুকে পড়ি হাজার পর্যটকের ভিড়ে ভেনিসের বড়াল পাড়া কিংবা নিমু গোস্বামী লেনে। সঙ্কীর্ণ গলি, দু'ধারে সাজানো বিপণী। হোটেলের সিঁড়ি। কোথায় চলেছি জানি না। এ যেন নবমীর ভিড়ে কলকাতায় ঠাকুর দেখার জনসমাগম। সারা দুনিয়ার মানুষজন তাদের ভাষায়, চেহারায়, গায়ের রঙে, আচরণে এক চলমান বর্ণময় কোলাজ যেন।

চলার পথে এসে যায় এক অতি প্রাচীন ধ্যানগম্ভীর চার্চ। বাঁক নিতেই বিস্ময় - সেই চিরপরিচিত সরু ক্যানেল। তারই গায়ে তিন চার তলার ইমারতের পলেস্তারা খসা পাঁচিল। কাশ্মীর শ্রীনগরের প্রাচীন অংশ ঝিলমের শাখা খালে এমন দৃশ্য নজরে পড়েছিল। পাঁচ ছয় ফুট চওড়া এমন খালের ওপর নাকি সমগ্র ভেনিসে হাজার খানেক ব্রিজ আছে। খালে ট্যুরিস্ট নিয়ে চলেছে গন্ডোলা।

পুল পেরিয়ে এ-খাল, ও-খাল ও তার তীরবর্তী পরিচ্ছন্ন পাথুরে পথ পরিক্রমার পর হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিখ্যাত রিয়াল্টো ব্রিজের মাথায়। তলায় একের পর এক তীব্র বেগে দলবদ্ধ ভাবে রোয়িং করে চলেছে নানা বর্ণের রোয়িং বোট। তাদের উৎসাহ যোগাচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার পর্যটক। দু'ধারে রয়েছে উঁচু উঁচু বাড়ি, বেশ কিছু প্রাসাদ। এদের অনেকগুলোই বিখ্যাত ধনীদের, যাদের কারো কারো বয়স নাকি ৯০০ বছর। মুখোশ থেকে কানের দুল, টি-শার্ট থেকে কিউরিও নিয়ে সারি সারি দোকানে বাংলাদেশী বিক্রেতা। চলন্ত ভেপোরেতো থেকে পর্যটকদের উৎসাহ যোগানো চিৎকার। ভেনিসের এ-এক অপূর্ব মোহিনী রূপ। ভেপোরেতো হল এ-শহরের যাত্রীবহনকারী বেসরকারি জলযান।

ভেনিস

এক সরু খালের ছোট্ট ব্রিজ অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত নির্জন গলির সুউচ্চ ইমারত ঘেঁষা পাথরের বেঞ্চে বসে পড়ি। বিশ্রাম ও জাবর কাটার উপযুক্ত স্থান বলা যায়। সঙ্গী কেনাকাটায় ব্যস্ত। আমি ওই রসে বঞ্চিত। স্বভাবতই মন দর্শন-সন্ধানী হয়। কবে কোন পঞ্চম শতাব্দীতে এড্রিয়াটিকের উত্তর থেকে কিছু মানুষ বর্বর জাতিদের আক্রমণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই জলাভূমিতে বসতিস্থাপন করেছিল। কোচিনের উইলিংডনের মত ভেনিসে মানুষের তৈরি একটি মাত্র দ্বীপ আছে, যেটা বর্তমানে পার্কিং লট।

এখানে জলের ওপর নির্মিত বাড়িগুলো নাকি লার্চ গাছের গুঁড়ি পুঁতে বানানো, যে গাছ জলে লোহার মত শক্ত থাকে আর রোদে শুকোলেই ভঙ্গুর হয়। এই শহরেও পিয়াৎসার ছড়াছড়ি। সমুদ্রের জোয়ারে জলে নিমজ্জিত স্যান মার্কো পিয়াৎসাতে সর্বদাই উৎসবের মেজাজ। এখানে পিজন ফিডিং না করলে জীবনই বৃথা যেন। ব্যাসিলিকায় হেলেনিস্টিক শিল্পধারা। এই শহর ১২০৪-এ ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভেনিসের গৌরব বিশ্বজোড়া, যার সলতে পাকানোর অধ্যায়টি শুরু হয়েছিল সেই দশম শতাব্দীতে। তার প্রমাণ পালাৎসা ডুকলের ৩২৪ ফুট উঁচু কম্পানিলটি। ফ্লোরেন্সে যেমন মেদিচি পরিবার, ভেনিসে তেমন ডজেসরা। সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে ১৭৯৭ তে নেপোলিয়নের ভেনিস অধিকার পর্যন্ত ছিল তাদের শাসন। এই সময়কালেই ভেনিস তার গরীমার উত্তুঙ্গ শিখরে ওঠে। ফ্লোরেন্সের মতো এখানেও আবির্ভাব ঘটে অসংখ্য শিল্পীর। জর্জিয়োনি, বেল্লিনি, টিনটোরেটোর মতো শিল্পীদের চিত্র এখানকার নানা মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করেছে।

ক্যানালের পাড়ধরে হেঁটে চোখে পড়ে দূরে ছোট্ট এক দ্বীপ, চার্চ ও সংলগ্ন টাওয়ার। স্বভাবতই এক বিবাগী ভাবনায় সংক্রামিত হই। ইউরোপের তিনটি দেশ সমুদ্র শাসনে চমক দিয়েছে বিশ্বকে। এরা হল পর্তুগাল, ইতালি আর হল্যান্ড। ভবঘুরে চূড়ামণি মার্কো পোলো (১২৫৪-১৩২৪) এই শহরের ভূমিপুত্র।

১২৬০ সনে দুই ভেনিসীয় বণিক ভ্রাতা মাফেও ও নিক্কিলো পোলো ভলগা ধরে সারাই যায়। পথে গৃহযুদ্ধে আটকে গিয়ে আরও পূবে চিন চলে যায় তারা। তিন বছর বুখারাতে হুলাগু খানের কাছে ভি.আই.পি. মর্যাদায় অবস্থানের পর মোঙ্গল রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে বুখারা ছেড়ে তারা সমরখন্দ, কাশগড় হয়ে ও গোবি অতিক্রম করে অবশেষে ১২৬৬ তে পিকিং (অধুনা বেজিং) পৌঁছায়। চিনে তখন ইউয়ান সাম্রাজ্য (১২৬৪-১৩৬৮)। কুবলাই খান দুই ভাইকে পোপের কাছ থেকে একশ জন খ্রিস্টান বিজ্ঞানী আনার অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে সোনার প্লেটে পাশপোর্ট সমেত ঘোড়া ও প্রহরী দেন। অবশেষে ১২৬৯ সালে তারা ভেনিসে ফেরে।

দ্বিতীয়বার মার্কো পোলোর বয়স যখন পনেরো এই দুই ভাই কিশোর মার্কোকে নিয়ে পুনরায় যাত্রা করে। এবার তারা আর্মেনিয়া, পারস্য, পামির, আফগানিস্তান হয়ে হর্মুজ প্রণালী ও তাকলামাকান ধরে চিনে পৌঁছায়। এ যাত্রায় কুবলাই খান মার্কোকে ভারতে ও ব্রহ্মদেশে পাঠান। তরুণ পোলোই পামির গ্রন্থির নামকরণ করেন। চিনের যেসব বস্তু পোলোকে অভিভূত করে তার মধ্যে এ্যাসবেস্টস ও কয়লা অন্যতম। তিনি মোঙ্গলদের শাসনাধীন চীনে প্রথম কাগজের নোটও দেখেন।

১২৯৫ সালে দেশে ফিরে মার্কোপোলো আর এক নগর-রাষ্ট্র জেনোয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ভেনিসের হয়ে এক বহুদাঁড়ের যুদ্ধ নৌকা নিয়ে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বন্দি হন। বন্দি অবস্থায় পিসা-র এক সহবন্দী রুস্তি চেল্লোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। চেল্লো ছিল রোমান্টিক লেখক।

পোলো বন্দি দশায় বন্ধু চেল্লোকে তাঁর বিশাল ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বললে চেল্লো তাকে সাহিত্যে রূপ দেয়।

ইতালির অন্য কিছু শহরের মত ভেনিসের সঙ্গেও সেক্সপিয়ার জড়িয়ে আছেন। তাঁর ৩৭টি নাটকের এক তৃতীয়াংশেরই পটভূমি ইতালি। কোন কোন পন্ডিত নাকি বিশ্বাস করেন সেক্সপিয়ার আদতে ছিলেন ইতালিয়। আরো স্পষ্ট করে বললে সিসিলীয়। তাঁর বাবা ছিলেন কেলভিন পন্থী। তাই প্রথমে ভেনেটো ও পরে তাঁরা ইংল্যান্ডে যান। ভেনেটোর পটভূমিতে রচিত নাটকগুলো হল পাদুয়ায় টেমিং অফ দ্য শ্রু। ভেরোনায় রোমিও-জুলিয়েট ও টু জেন্টলমেন অফ ভেরোনা। ভেনিসে মার্চেন্ট অফ ভেনিস এবং ওথেলো। ১৫৯৬-৯৮ এই সময়কালে তাঁর মার্চেন্ট অফ ভেনিস রচিত। এমনটা বলা হয়ে থাকে যে তাঁর ইতালির পটভূমিতে সৃষ্ট সব নাটকের মধ্যে ভেনিসই অবয়বে সব চেয়ে কম পাল্টেছে। সে যুগের ক্যানেল, গন্ডোলা, চার্চ, জুইস ঘেট্টো, বিয়েলটো ব্রীজ সব কিছু আজও বর্তমান। কেবল রিয়েল্টো তখন ছিল কাঠের।

সে যুগে ইহুদিরা বিশেষ নির্বাচিত এলাকায় (বর্তমানে স্টেশন এর সমীপবর্তী ফাউন্ড্রি) ঘেটোতে বাস করত। ঘেটো শব্দটা নাকি ভেনিসীয় গেটোর অপভ্রংশ যার অর্থ ফাউন্ড্রি। সেক্সপিয়রের যুগে এ-শহরের ইহুদিরা এই ঘেটোতে ১৫১৬ থেকে বাস করতে বাধ্য হত। সেখানেই শাইলক তার পরমাসুন্দরী কন্যা জেসিকাকে নিয়ে থেকেছে। প্রতি সূর্যাস্তে খ্রিস্টান প্রহরীর পাহাড়ায় বন্ধ হত ধাতব গেট। আবার সূর্যোদয়ের পর তারা যে যার কাজে যেত। শাইলকের সময়ে ভেনিসে ইহুদির সংখ্যা ছিল ৫০০০ (বর্তমানে নাকি ২০০০ এর মতো) সেকালে স্থান সংকুলানের জন্য সাততলা পর্যন্ত বানানো হত ঘেটোর আবাসন। এদের অনেকগুলোই আজও অভিজাত মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করছে। বর্তমানে অবশ্য স্থানীয় ইহুদিরা আর জ্যুইস ডিস্ট্রিক্টে বাস করে না।

দিনের শেষে ট্রেনে পাদুয়া ফেরার পথে মনে হল ভেনিস সম্পর্কে চার্লি চ্যাপলিন যথার্থই বলেছেন, I like Venice better when tourists are there, because they give warmth and vitality to what could easily be a graveyard without them. এই প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেতাটি আটবার ভেনিস ভ্রমণ করেন। কেন কি জানি আমার দ্বিতীয়বার ভেনিস আসার ইচ্ছে হচ্ছে না। মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের সঙ্গে বয়সের এক জোরালো সম্পর্ক থাকে। সেটাই বোধ হয় কারণ।

If Itely were Monalisa, the Florence would be her smile. শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কোনও এক সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন ইউরোপের কোন শহর সার্বিক বিচারে তাঁর সবচেয়ে পছন্দের? উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী নাকি বলেছিলেন ফ্লোরেন্স। এটা কে না জানে মধ্য ইতালির তাসকানি অঞ্চল প্রকৃতি ও সংস্কৃতি দুই দিক দিয়েই ভ্রমণপ্রিয় মানুষের কাছে অপ্রতিরোধ্য হাতছানি। ঢেউ খেলানো প্রাকৃতিক পরিবেশে উত্তরের এ্যালপাইন শীতলতা আর দক্ষিণ ইতালির উষ্ণতার কোনটারই আধিক্য এখানে নেই। জলপাই, আঙুর, দিগন্তপ্রসারি বাগিচা, চার্চ, নির্জন ক্যাসেল আর সবুজ ভেদ করা ছবির মত রাস্তায় দ্রুত ধাবমান যান দেখতে দেখতে ফ্লোরেন্সে এলাম দুপুর বারোটায়।

স্টেশন থেকে মিনিট আষ্টেক হাঁটাপথে সরু পাথর বিছানো সরণির ওপর আমাদের আস্তানা। দুটো চারতলা বাড়ির মাঝে গায়ে গায়ে সাটা ইউরোপের পরিচিত তিনতলা টের‍্যাসড বিল্ডিং। সরু ফুটপাথ লাগোয়া গ্রাউন্ড ফ্লোরেই লম্বা ঘর। ফোনে যোগাযোগ করলে একটুক্ষণের মধ্যেই হাসতে হাসতে হাজির ইতালীয় মালকিন। ঠিক যেন সত্তর দশকের হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী ফরিদা জালাল।

গেট খুলতেই মনে হল যেন ঢুকে পড়লাম ষোড়শ শতকে। তিনদিকে পাথরের দেওয়াল মাথার ওপরে বিশাল বিশাল কাঠের গুড়ির জয়েস্টের ওপর বিছানো কাঠের পাটাতনের সিলিং। সাজানো কিচেন, চার ওভেনের গ্যাস। ফ্লাক্সে চা, কফি, চিনি, কাপবার্ডে রান্নার সরঞ্জাম।

স্ট্যান্ডিং ফ্যান দেখিয়ে মজা করে মেয়েটি বলল, 'ইয়োর এয়ারকন্ডিশনার।' ফ্লোরেন্সের ট্যুরিস্ট ম্যাপ দিয়ে কেবল মাত্র তিনদিনের ঘর ভাড়ার ওপর ধার্য ট্যাক্সটুকু নিয়ে জানালো বাকি টাকা ওর দাদা নেবে। সে এখন ছুটি কাটাতে অন্য শহরে গেছে। প্রাণোচ্ছল মেয়েটি তার ইংরেজি বলার অক্ষমতার জন্য বার বার দুঃখ প্রকাশ করছে। তার বারো আনা ইটালিয়ান আর চারআনা ইংরেজি বুঝতে আমাদেরও কম মেহনত করতে হচ্ছে না। তাই কথোপকথন চালানো গেল না বেশিক্ষণ।

বিশ্বের মানচিত্রে ইতালি-বাভারিয়া-বোহেমিয়া যখন ছিল নবজাগরণের কেন্দ্র তখন ফ্লোরেন্স ছিল ইতালির রেনেসাঁর ধাত্রীগৃহ। এই নগরীর জন্য আমরা মাত্র তিনরাত দিয়েছি। দ্রষ্টব্যের বিচারে এটা কিছুই নয়। আমাদের হস্টেলের খুবই কাছে উফিজি চত্বর। চা বানিয়ে স্নান ও সংলগ্ন রেস্তোঁরায় ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা পৌঁছে যাই উফিজি গ্যালারি। এই সকালেই টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইন। ইউ আকারের ঐতিহাসিক ভবনের সামনে বয়ে চলেছে আর্নো রিভার। নদীর ওপর কিছু দূরে ঐতিহাসিক সেতু। গ্রাউন্ড ফ্লোরে সারি সারি প্রতিটি স্তম্ভের সম্মুখে বিখ্যাত ব্যক্তির মর্মর মূর্তি। অনেকেই অগ্রিম ই-টিকিট কিনে এসেছে ভ্রমণে সময় সংক্ষেপ করতে। আমরা তাদের দলে নেই। এক প্রৌঢ়া ভিখারিণী শিল্পভুক দর্শকদের কাছে নীরবে যাঞ্চারতা। রূপে-লাবণ্যে-পোশাকে যদিও তিনি অপরূপা।

এক আর্জেন্টিনীয় যুগলের পিছনে দঁড়িয়ে গেলাম। ল্যাটিনো ইটালিয়ান উফিজি শব্দের অর্থ অফিস। বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের দপ্তরখানাই আজকের উফিজি গ্যালারি। বিশ্বে সর্বাধিক দর্শক আকর্ষণকারি আর্ট গ্যালারিগুলির একটি এই রত্নাকর সংগ্রহশালাটি। সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছে এখানে ২০১৬ তে ২০ লক্ষ পর্যটক এসেছিল।

ইতালির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পঞ্চম শতাব্দীতে রোমুলাস অগস্টাসের সঙ্গে সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ইতালির অনেকাংশের দখল নেয়। নবম

শতকে ফরাসী শার্ল মেইনের মৃত্যুর পর দুর্বল ইতালিতে একাধিক নগর রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে জেনোয়া, পিসা, ভেনিস, সিয়ানা, ফ্লোরেন্স ছিল অন্যতম। এদের মধ্যে যুদ্ধবিবাদ, হিংসাত্মক ঘটনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবুও ক্যাথলিক চার্চ এর বিস্তার ও সৃজনশীল শিল্পের বিকাশ ও চর্চা এতটুকু থামেনি। ইতালির এই সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে কোথায় যেন পড়েছিলাম এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য। কথাটা মোটামুটি এই রকম, [In Italy], they had warfares, terrors, murders and bloodshed but they produced Michael Angelo, Leonardo Da Vinchi and the Renaissance and in Switzerland they had 500 years of democracy and peace and what did they produce? A Cuckoo Clock.'

কথাটা প্রনিধানযোগ্য সমাজে অনাহার, সংকট, উত্তেজনা সংঘর্ষ থাকলেই বোধ হয় সৃষ্টিশীলতা জাগে। গ্রেট বেঙ্গল ফেমিন, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও তার পরে পরেই বিশ্বে বৃহত্তম গণপ্রচরণ (Human migration), এমন কী ষাট সত্তরের উত্তাল সময়েও আমাদের হতভাগ্য বাংলায় সৃষ্টিশীলতার বন্যা বয়েছিল। পরবর্তীকালে নিস্তরঙ্গ বঙ্গজীবনে চলছে অন্তহীন সৃষ্টিহীনতা।

সেই যুগে এই মেদিচি পরিবার ফ্লোরেন্সের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করত। কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা বা নগরের শাসনই নয়, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রেই পৃষ্ঠপোষকতার এক অনবদ্য নজির রেখেছিল এই পরিবার। ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে জিওভান্নি দ্য মেদিচি পোপের কোর্টের ব্যাঙ্কার নিযুক্ত হলে এই ফ্লোরেন্সকেই তার প্রধান কেন্দ্র বানিয়াছিলেন।

১৪২৯ খ্রিস্টাব্দে জিওভান্নির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কোসিনো দ্য মেদিচি পিতার ব্যাঙ্ক ব্যবসার হাল ধরেন। মানবতাবাদী, প্রজ্ঞাবান কোসিনোর বয়স তখন ৪০ বছর। তিনি উদারহস্তে শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ১৪৬৪ তে তিনি মারা যান। এই সময়কালে কোসিনো উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পচর্চায় ছয়লক্ষ স্বর্ণ ফ্লোরিন খরচ করেন। যেটা উল্লেখ্য তা হল পিতার থেকে তিনি নাকি একলক্ষ আশি হাজার স্বর্ণ ফ্লোরিন পেয়েছিলেন।

কোসিনোর পুত্র মাত্র পাঁচ বছর ফ্লোরেন্স শাসন করেন। তারপর স্থলাভিষিক্ত হন পৌত্র লোরেঞ্জা দ্য মেদিচি, যিনি সঙ্গত কারণেই ম্যাগনিফিসেন্টে লোরেঞ্জো নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সময়ে (১৪৬৯-১৪৯২) ফ্লোরেন্স ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। তাঁর অন্যতম কীর্তি হল সেখানে অনভিজাতদের স্বাধীনতা।

দুঃখের বিষয়, এই ম্যাগনিফিসো লোরেঞ্জার মৃত্যুর পরেই ফ্লোরেন্সের ইতিহাসে চার পুরুষের মেদিচি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। তারা ফ্লোরেন্স ত্যাগে বাধ্য হয়। এর অন্যতম কারণ জিরোলামো ম্যাভোনারোলা নামে এক ফ্যানাটিক পুরোহিতের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উত্থান।

বিশ্ব ইতিহাসে মেদিচি পরিবারের মতো শিল্পের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় কেউ আছে কিনা সন্দেহ। বিত্ত, বিদ্যা ও উদ্যোগের এমন সুষম সমাবেশ ও বেনজির পরম্পরার সঙ্গে পরবর্তীকালে ভ্যাটিকানের সামিল হওয়ার ঘটনা ইতালির প্রাচীন ভূমিতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁর এই বুদ্ধিমুক্তির সলতে পাকানোর অধ্যায়টা রচিত হয়েছিল আড়াইশো বছর আগে। তাতে ফ্লোরেন্সের সঙ্গে শামিল হয়েছিল পাদুয়া, পিসা, সিয়ানা, প্রাগের মতো শহরগুলোও। ভারতে সে সময় চলছে অন্ধকার সুলতানি যুগ।

দেখতে দেখতে লাইনে একটা ঘন্টা কেটে গেল। প্রবেশ করলাম বিশ্ববিখ্যাত গ্যালারিতে যার পত্তন হয় কোন ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন লরেঞ্জোর বংশধর প্রথম কোসিনো ১৫৬০-এ। তিনতলার বিশাল সৌধের দুটো তলা জুড়ে যা সংগ্রহ তা দেখতে কয়েক দিন লাগার কথা। তিনতলার ৪৫টা ঘরে মেদিচিদের যা কিছু মূল্যবান সংগ্রহ রাখা।

পারীর ল্যুভেরে যেমন মোনালিসা এখানে তেমন ভেনাস। আবক্ষ মোনালিসাকে দর্শন করেছিলাম অপ্রত্যাশিত ঘরের আলো আঁধারিতে। ছবি তোলায় ছিল প্রহরীর বাধা। এখানে পূর্ণাবয়ব বত্তিচেল্লির বার্থ অফ ভেনাসকে পাওয়া গেল আলোকিত প্রশস্ত ঘরে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে। ছবি তোলায়ও কোন বাধা নেই। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি একাকার যেন। ঘর ভর্তি বত্তিচেল্লি। এটি সংগ্রহশালার সবচেয়ে আলোচিত ও বিখ্যাত শিল্প কর্ম হলেও তাঁর মোট ২৭টি ছবি রয়েছে এখানে। তার মধ্যে বিখ্যাত এই ভেনাস ছাড়া আছে আলেগরি অফ স্প্রিং ছবিটিও।

বার্থ অফ ভেনাস ছবিটি প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবীর জন্ম মুহূর্তটিকে ধরে রেখেছে। সাইপ্রাস দ্বীপে ফেনিল সমুদ্রজাত ঝিনুকটি উন্মুক্ত

উফিজির শিল্পকর্ম।

With the best Compliments from :

Phone : 2237-5919
2237-2090
2237-2822
Fax : 2237-0269
E-mail : kolkata@allindatpt.com
Web-site : www.allindiatpt.com

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

H.O. : 28, BLACK BURN LANE,
KOLKATA-700 012

Time Guaranteed delivery. Transporters for all over India, Marine type ISO Container trucks available. Bank-approved specialists in ODC Cargoes by heavy duty Trucks & Trailers. Specialists in packing of household goods & Transpotation. Branches & Association all over India.

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

করেছিল ভেনাসকে। বসন্তের সাগরবেলায় নগ্ন ভেনাসকে স্বাগত জানাচ্ছে পুষ্পগুচ্ছ। লোরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের ভাই লোরেঞ্জো পিয়েরফ্রান্সেসকো দ্য মেদিচি এই ছবিটি এই প্রাসাদে আনে। বত্তিচল্লির এই অসামান্য শিল্পকর্মটি ১৪৮৩-৮৫ সময়কালে নির্মিত। এছাড়া অবশ্যই উল্লেখযোগ্য আর একটি বত্তিচেল্লি ছবি হল ক্যালোমনি অফ এ্যাপেলস। এখানেও পূর্ণাঙ্গ মূর্তির দীর্ঘ কেশদামের নগ্ন সুন্দরী উপস্থিত।

বত্তিচেল্লির সময়ে অন্যতম সেরা সুন্দরী ছিলেন বিখ্যাত আমেরিগো ভেসপুচির পরিবারের সদস্যা সিমোনেটা ভেসপুচি। তিনি ছিলেন লোরেঞ্জোর ভ্রাতা জুলিয়ানোর প্রণয়িনী। জুলিয়ানো ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রালে নিহত হন। পোর্ট অফ ভেনিসের সমুদ্রকূলে সিমোনেটা বাস করতেন। বত্তিচেল্লির ভেনাস ও অন্য অনেক ছবির প্রধান নারীমুখ নাকি সিমোনেটাকে ভেবে অঙ্কিত। মাইকেল এঞ্জেলোর মত বত্তিচেল্লিও ছিলেন অবিবাহিত। যে মহান শিল্পী তাঁর শিল্পগুণে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ শিল্পপ্রেমীকে মুগ্ধ করে চলেছেন সেই বত্তিচেল্লিই জীবনের শেষ দশ বছর কাটিয়েছেন অসীম নিঃসঙ্গতায়।

উফিজিতে অন্যতম আলোচিত চিত্র হল কাভারাজিওর মেদুসা। বৃত্তাকার ক্যানভাসে এই ছবিতেও গ্রীক পুরাণ উপস্থিত। এথেনার মন্দিরে পসেইডনের সাথে যৌনাচারের অপরাধে সেকালের অপরূপা মানবী মেদুসা দেবীর অভিশাপে বিষধর সর্পমণ্ডিত কেশদাম সজ্জিত হয়ে এক ভয়াবহ গুণসম্পন্ন হন। অভিশাপের কারণে যে মানুষের সাথেই তার দৃষ্টি বিনিময় হবে সে স্তম্ভিত পাথর হয়ে যাবে। হেরোডোটাসের মতে মেদুসা নাকি লিবিয়ায় বাস করত। তারা ছিল তিন বোন। অন্যরা স্থেনো এবং ইউরালে ছিল অমর। মেদুসার শিরশ্ছেদ করে পারসিয়াস নাকি সেই মুন্ডুর মূর্তি দেখিয়ে সকলকে পাথর বানাতো। গ্রীক পুরাণে যোদ্ধার ঢালে মেদুসার ছবি রাখার চলও ছিল। অন্তঃসত্তা মেদুসার মৃত্যু হলে জন্ম হয় পেগাসাস নামের এক অশ্ব আর এক স্বর্ণ তরবারির।

উফিজিতে না এলে জানাই হতো না সে যুগে কতো শিল্পীই না রেনেসাঁয় অংশ নিয়েছিল। এমনই একজন লিপ্পি। তাঁর একাধিক শিল্পকর্ম অবাক হওয়ার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। ডেভিড নির্মাতার একমাত্র পেন্টিং দ্য হোলি ফ্যামিলি (ডোনি টোন্ডো) এই সংগ্রহশালায় রাখা। হেলেনিস্টিক স্কাল্পচারের অনুসারি এই সৃষ্টি।

এখানে ১৫ নম্বর কক্ষ বিখ্যাত রেনেসাঁসের অন্যতম স্থপতি দ্য ভিঞ্চির জন্য। দ্য ভিঞ্চির ছবি রোমে দেখবো। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত লাস্ট সাপার মিলানে আছে। এই যাত্রায় মিলান আমাদের ভ্রমণচিত্রে না থাকায় সে ছবি দেখার সৌভাগ্য হবে না। তাঁর ছবির সংগ্রহ ইতালির বাইরেই বেশি। পারীর ল্যুভেরে আছে তাঁর সেরা ছবিগুলি। লন্ডনে আছে দুটো। এগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এবার তাঁর নিজের শহরে দ্য ভিঞ্চিকে দেখার পালা।

জন্ম ফ্লোরেন্সে হলেও উঠতি বয়সে মিলানে গিয়ে কুড়ি বছর কাটান লিওনার্দো। উফিজিতে ব্যাপটিজম অফ ক্রাইস্ট ছবিটি তাঁর গুরুর সঙ্গে যৌথ সৃষ্টি বলা হয়। ১৪৭৫ সালে এটি শেষ হয়। এটি দ্য ভিঞ্চির গুরু আঁদ্রে দ্য ভেরোক্কিওর সৃষ্টি। একদল পর্যটককে নিয়ে

লাওকুন, ভ্যাটিকান মিউজিয়াম।

আসা এক ইংরেজিভাষী গাইডের বর্ণনা থেকে জানলাম অনেক কলাবেত্তা মনে করেন ছবির বাঁ দিকের দেবশিশুর মূর্তি ও যিশুর মূর্তিও নাকি দ্য ভিঞ্চির আঁকা। উনানসিয়েসান ও অ্যাডোরেসন অফ ম্যাগি দ্য ভিঞ্চির একার আঁকা। দুটিই তাঁর প্রথম দিকের সৃষ্টি।

চিত্তাকর্ষক চিত্রগুলির মধ্যে পারমিজিয়ানিনোর ম্যাডোনার উল্লেখ না করলে শিল্প ও শিল্পী দুই এর প্রতিই অবিচার হবে। ইউরোপীয় চিত্রকলায় ইতালীয় রেনেসাঁ যুগে ম্যানারিজম শিল্প আন্দোলনে প্রভাবিত এই শিল্পীর এক সাহসী মাস্টারপিস বলা যায় এটিকে। দীর্ঘ গ্রীবার এই ম্যাডোনা সংগ্রহশালার নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন।

বিখ্যাত উফিজির শিল্প সংগ্রহে ঠাসা করিডোর ধরে হাঁটা অবশ্যই এক বিরল সৌভাগ্য। প্রতিটি সংগ্রহই যেন মেদুসা আক্রান্ত করে। স্তম্ভিত পাথর হতে হয়। এমনই এক শিল্পকর্মে ঠাসা ট্রিবুনা ডেগালি কক্ষে এসে প্রায় দিশাহারা হই। কাকে ছেড়ে কাকে দেখি! মল্লযোদ্ধারত বীরদের নানা ভঙ্গীর একাধিক মূর্তি থেকে টিটিয়ানের ভেনাস অফ উর্বিনোর মত ভাস্কর্যগুলো দিয়েই নাকি উফিৎসির পত্তন। এগুলো ছিল ফ্রানসিসকোর ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

একের পর এক শিল্পকর্মে কানায় কানায় রোমাঞ্চিত হতে হতে তৃপ্তিবোধের মাত্রা যখন হারাবো হারাবো তখনই হঠাৎ এসে দাঁড়ালাম এক প্রসস্থ কক্ষের কেন্দ্রে শায়িতা Sleeping Ariadne এর সামনে। লাগোয়া তথ্য জানাচ্ছে এশিয়ো প্রস্তরে নির্মিত এটি দ্বিতীয় শতাব্দীর। শিল্পী হিসেবে নাম পাচ্ছি Arte Romana, সময়কাল অজ্ঞাত। প্রাগ আর ভ্যাটিকান মিউজিয়ামেও এর প্রতিমূর্তি আছে। অনেকে এটি ক্লিওপেট্রার মূর্তি ভাবে। ভাস্কর্যটির কেবল দেহ আর বিছানার অংশ বিশেষ আসল। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপিত। ষোড়শ শতকে নির্মিত মাথা ৫৬নং ঘরে রাখা। সেটির প্রতিস্থাপন ঘটায় অষ্টাদশ শতকের শিল্পী ফ্রানসেসকো কারাডোরি।

এই উফিজির অন্য একটি রুদ্ধশ্বাসে দর্শনীয় শিল্পকর্ম হল বান্দিনেল্লির লাওকুন অ্যান্ড হিজ সন্স। হেলেনীয় ভাস্কর্যে প্রভাবিত কাজটি ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে রোমে মাটি খুঁড়ে পাওয়া। প্লিনির লেখায়

এটির উল্লেখ আছে। সফোক্লিস ও ভার্জিল উভয়েই লাওকুনকে ট্রয়ের পুরোহিত বলেছেন, যদিও হোমারের লেখায় লাওকুনের ঘটনা নেই। এটি অনেকটা বাল্মীকির রামায়ণে অনুল্লেখিত অনেক ঘটনার মত। ভার্জিল তাঁর এনিড কাব্যে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই প্রজ্ঞাবান পুরোহিত ট্রয়ের ঘোড়া নগরীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করে বর্শার আঘাতে বিদ্ধ করলে দুইপুত্র সমেত প্রাণ হারান। এখানেও বিষধর সাপের মূর্তিগুলোকে বেস্টন করে থাকা লক্ষণীয়।

এক সময় এই প্রাচীন ও বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রহশালার শেষাংশে এসে উপস্থিত হই। বোঝা গেল মহাভোজের শেষ পদ এখনো বাকি। সেফ ল্যান্ডিং এর পর দাঁড়িয়ে থাকা বিমানের ক্রুর মত দণ্ডায়মান এক ভাস্কর্য। বিষয় বস্তু, হারকিউলিস ও নেসাসের লড়াই। অশ্ব-মানবের রক্তেই হারকিউলিসের মৃত্যু হওয়ার কাহিনি গ্রীক পুরাণে আছে। তাকে ঘিরে এই শিল্পকর্মটি ভুবন বিদিত। রাখাও হয়েছে উপযুক্ত স্থানে দর্শকমাত্রই এটি দেখে উফিজি ছাড়তে বাধ্য। পাশেই exit গেট।

বাইরে যেতেই খোলা-ছাদ রেস্তোরাঁয় নীল আকাশ। রোদে ঝলমল প্রকৃতি। পাশেই রাজকীয় মহিমায় দাঁড়িয়ে ভেসিও প্রাসাদ, পালাৎজো ভেসিও। অসামান্য তার স্থাপত্য সৌন্দর্য। এই প্রাসাদের অভিজাত সৌন্দর্যকে যেটি চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেছে তা হল একটি অতি উচ্চ আয়তকার মিনার যার পোশাকি নাম কাম্পানিল বা বেল টাওয়ার। ইতালিতে বড়ো চার্চ বা ক্যাথিড্রালের সঙ্গে সাধারণত একটি কাম্পানিল থাকবেই। এই টাওয়ার সকালে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েও দেখেছি। কিন্তু উফিজির ত্রিতলের কাফেটেরিয়ার ছাদে হঠাৎ এসে পৃথিবীর নানান দেশের আর্ট লাভারদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে এত সামনে থেকে তাকে অবলোকন করে অভিভূত হতে হয়। অনেকটাই সময় লাগল ধাতস্ত হতে যে আমি ফ্লোরেন্সের ভূমিতে ভেসিও প্রাসাদের বেল টাওয়ারের ঘড়িতে দেখছি বারোটা বাজে। লোকে এই স্বর্গীয় অতি জাগতিক অনুভূতির প্রতিটি ভগ্নাংশ সেকেন্ডকে ঐহিক ভাবে অনুভব না করে সেলফিতে ব্যস্ত। ইউরোপে প্রথম প্রবাসে ওয়েষ্ট মিনস্টার স্টেশন থেকে বেড়িয়েই বিগবেন দেখেও অনুরূপ অনুভূতি হয়েছিল। তবে আজকের অবস্থা অনেক অনেক বেশি স্পর্শকাতরতায় ভরা।

গত তিন-চার ঘণ্টা ধরে এই সংগ্রহশালায় রাখা শিল্পের সুনামির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা যে হারিয়ে ফেলেছি সেই উপলব্ধিটা জানার জন্য এই অসাধারণ কাফেটেরিয়াটার গুরুত্ব অসীম। কবি হলে এই মুহূর্তটাকে নিয়ে কোন কালজয়ী কাব্য সৃষ্টি করা যেত। কুকিস আর কাপুচিনো হাতে নিয়ে মনে হল এই অবস্থাটারই কি নাম 'ফ্লোরেন্স সিনড্রোম?' উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক স্তাঁধাল কি উফিজি দেখেই এমন সাময়িক ভাবে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, বাহ্যজ্ঞান হারানো বা অস্বস্তিকর মাথা ঘোরার কথা বলেছিলেন? এবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন একস্থানে বিপুল সংখ্যায় সুন্দর এবং শিল্পবস্তুর সমাবেশ প্রত্যক্ষ করলে অনেক মানুষই এহেন অবস্থার শিকার হয়। রক্তচাপও নাকি বেড়ে যায়। তাই এই অবস্থার অন্য নাম স্তাঁধাল সিনড্রোম।

কফিতে চুমুক দিয়ে ভাবতে থাকি। মেদিচিদের তিনশো বছর পরে কলকাতায় ঠাকুর পরিবারও হয়তো মেদিচি হতে পারত। প্রিন্স দ্বারকানাথ কিছুটা হলেও জিওভান্নি হয়েছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কোসিনো মেদিচি হতে পারলেন না। বাবাকে লুকিয়ে হেদুয়ায় ঘর ভাড়া করে ব্রহ্মর স্বরূপ নিয়ে মেতে থাকলেন। মহর্ষি হওয়ার পর প্রজানিপীড়ক পরিচিতি পেলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে অধ্যায়কে অনেকে বাংলার রেনেসাঁস বলে থাকে তা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেই সীমাবদ্ধ থাকলো। আমাদের বোধ হয় একটা ভারতীয় ভ্যাটিকানের প্রয়োজন ছিল।

এক সময় বুঝলাম দামি ওয়াইনের প্রভাব ফিকে হওয়ার মত আমার ফ্লোরেন্স তথা স্তাঁধাল এফেক্টও কাটতে চলেছে।

পাদুয়া, ভেনিস, সিয়ানা কিংবা ফ্লোরেন্স প্রতিটি শহরই যেন কলেবরে ঠিক ততটুকুই, যতটুকু প্রয়োজন। এমনকি বডিমাস ইন্ডেক্সের মত শহরগুলোর আয়তন জনসংখ্যার অনুপাত যদি কষা যায় তাহলেও হয়তো বাঞ্ছিত সংখ্যা মিলবে। পর্যটকদের বাদ দিলে স্থায়ী নাগরিকের সংখ্যা বোধ হয় সেই ষোড়শ শতকেই রয়েছে। পায়ে পায়ে এ্যাকাডেমিয়াতে এসে সেটাই মনে হল। অনেকেই সময়াভাবে সিনোরিয়া চত্বরে ডেভিডকে দেখে ঘরে ফেরে। আমরা তাদের দলে নেই। তাই ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যদের দেখে কুইক বোহেমিয়ান লাঞ্চ সারি।

উফিৎসির তুলনায় অ্যাকাদেমিয়ার আয়তন ও সংগ্রহ সংখ্যায় কম হলেও ভারে নয়। আকাদেমিয়া মূলত এঞ্জেলোময়। হল অফ দ্য কলোসাসে বার্তোলিনির আরনিনা জিয়ানবলোগনার রেপ অফ দ্য সাবাইন এর প্লাস্টার কাস্ট মডেল দেখে বাঁক নিয়ে লম্বা হল ঘরে ঢুকেই চমকে যাই। দূরে হাল্কা নীলাভ আলোতে উদ্ভাসিত শ্বেতশুভ্র দণ্ডায়মান ডেভিড। দীর্ঘ কক্ষের দু'পার্শ্বে একের পর এক এঞ্জেলোর অসম্পূর্ণ নানা বয়সী শ্লেভ পুরুষের অনিবাচ্য ভাস্কর্য। এগিয়ে চলি এই পৃথিবীর সর্বাধিক নরনারী যে পুরুষটির দর্শন প্রার্থী তার দিকে। সর্বাঙ্গে কৈশোরের মিহিলাবণ্য নিয়ে দণ্ডয়মান ডেভিড। পাঁচশো বছরেও তার অতুলন যৌবনে এতটুকু টোল খায়নি। প্রাণভরে দর্শন করি। ল্যুভেরের অপরিসর কক্ষের মোনালিসার মত নেই কোন প্রহরীর তাড়া। ধন্য ইতালি, ধন্য তার নবজাগরণ। যে মেয়েটিকে একটু আগে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে বার্গার খেতে দেখেছি, কিছুটা ব্যবধানে এককোণে দাঁড়িয়ে সে নির্নিমেশে দেখছে দিব্যকান্তির ডেভিডকে। কেবল কি সে একা?

'বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা।

মনে হল ডেভিড আর একলব্য যেন একাকার। বয়সের দিক দিয়েতো বটেই, হয়তো বীরত্বেও। একজন তার শক্তি ও দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পেয়েছে (অন্য ভাবে বললে বাইবেলের কাহিনি সে সুযোগ দিয়েছে) অন্যজন তা পায়নি। হিব্রু বাইবেলে ডেভিডের কাহিনী এই রকম - ইজরেইলের পশ্চিমে প্যালেস্টাইন। দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক। গোলায়াথ নামের এক দীর্ঘদেহী ফিলিস্তিনী ইজরেইলীদের আক্রমণ করত। সম্মুখ সমরে ইজরেইলের

সুশিক্ষিত সৈন্যরা পেরে উঠত না। অবশেষে পিতার আদেশে ডেভিড তার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়া দুই দাদার খোঁজ নিতে গেলে গোলিয়াথের মুখোমুখি হয়। ইজরেইলের রাজা ডেভিডকে অস্ত্র সাহায্য ও ব্যবহারের কথা বললে ডেভিড উন্নত অস্ত্র চালনায় তার অক্ষমতা জানিয়ে গুলতি ও পাঁচটি ছোট পাথর খণ্ড নিয়ে গোলায়াথকে পরাভূত ও ধরাশায়ী করে তার তরবারির সাহায্যে মুণ্ডচ্ছেদ করে।

এঞ্জেলোর ডেভিড নির্মাণের ইতিহাসটি কম আগ্রহোদ্দীপক নয়। ভেরোকিওর ওয়ার্কশপে এঞ্জেলোর তখন শিক্ষানবিশির জীবন কাটছে। বেশ কিছুদিন ধরেই সামনের বাগানে পড়েছিল এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড। শিল্পী ফিসোল ১৮ ফুট লম্বা পাথরটি আনিয়েছিলেন এক দৈত্যর মূর্তি গড়বেন বলে। কিন্তু কাজ বেশিদূর এগোয়নি। অগস্তিনো দুচ্চিও এবং আন্তোনিও রোসোল্লিনোর মত ভাস্কর শিল্পীরাও বাটালির কিছু দাগ রেখে বিরত থাকেন। বছর দশ পড়ে থাকা এই প্রস্তরখণ্ডকে নিয়ে তিনবছরের চেষ্টায় (১৫০১-১৫০৪) ২৬ বছরের মাইকেল এঞ্জেলো বুয়োনায়টি আপ্তবাক্যটি সত্য প্রমাণ করলেন One man's trash being another's treasure. পৃথিবী পেল ডেভিডকে।

ফ্লোরেন্সের দুই মহান ভূমিপুত্র দ্য ভিঞ্চি আর এঞ্জেলো। এঞ্জেলোর শুরুটা হয়েছিল চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। শুরু করেন শিক্ষানবিশি গিরলানডাইয়োর কাছে। পিতা চেয়েছিলেন ছেলে ব্যবসা করে অর্থ করুক। কিন্তু প্রতিভা তার পথ খুঁজে নেবেই। চিত্রশিল্পী থেকে ভাস্কর্যশিল্পে এঞ্জেলোর আগ্রহ জহুরির দৃষ্টি নিয়ে আবিষ্কার করেন লরেনজো মেদিচি। আমূল পাল্টে যায় এঞ্জেলোর জীবন। ১৫০৪ সালে ডেভিড জনসমক্ষে উন্মোচিত হলে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। ফ্লোরেন্স ছাড়িয়ে সারা ইতালিতে তখন এঞ্জেলো এক ফেনোমেনন।

ষোড়শ শতকে গড়া ৫.১৭ মিটার এর এই নগ্ন পূর্ণাবয়ব পুরুষের মূর্তি দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল আরও অতীতে নবম শতকে গড়া ১৬৭.৫ মিটারের আর এক পুরুষ মূর্তির কথা। ডেভিডের সৃষ্টিকর্তাকে আমরা জেনেছি। কিন্তু এই মূর্তির কারিগর বা কারিগররা হয়তো মনে করতো শিল্পই শেষ কথা শিল্পী নয়। আমরা ভারতবর্ষ থেকে আসা মানুষ। তাই নিজেরই দেশের শ্রবনবেলগোলার গোমতেশ্বরকে স্মরণ করি।

ডেভিডের প্রথম দর্শন পাই পঁচিশ ফুট দূর থেকে। বহুবলী গোমতেশ্বরকে চোখে পড়েছিল চোদ্দ কিলোমিটার দূর থেকে। পড়ে থাকা পাথরখণ্ড থেকে ছ'টনের ডেভিডের জন্ম। অন্যদিকে একটা গোটা পাহাড়কে ব্যবহার করে ডেভিডের সাতশো বছর আগে সৃষ্টি হয় ৮০ টনের বহুবলীর। চরিত্রদুটির মধ্যেও অদ্ভুত মিল। দু'জনেরই পুরুষকার থেকে দেবত্বে উত্তরণ। ইক্ষাকু বংশের প্রথম তীর্থঙ্কর রাজা ঋষভনাথ তথা আদিনাথের দুই পুত্র ভরত ও বহুবলী। বহুবলীর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। চিকিৎসাবিদ্যা, ধনুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা থেকে দুর্মূল্য রত্নচর্চা পর্যন্ত। পিতা ঋষভনাথ বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে দুইপুত্র সহ একশো ব্যক্তিকে তাঁর সাম্রাজ্য বন্টন করলে ভরত পান অযোধ্যা ও বহুবলী পান দক্ষিণ ভারত। কিন্তু ভরতের রাজ্য ক্ষুধায় পরাজিত হয়ে ৯৮জন বশ্যতা স্বীকার করলে বহুবলীকে কোন যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না ভরত। পরে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে বহুবলী এক জায়গায় দণ্ডমান থেকে অনশনের মাধ্যমে কঠিন সাধনা শুরু করেন। এক বছর অবিচল নির্বিকল্প সমাধিকালে তাঁর হাতে পায়ে তৃণলতা জড়িয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ভ্রাতা ভরত এসে ক্ষমাপ্রার্থী হন।

কী বিস্ময়কর মিল! ডেভিড আর বহুবলী একাকার। দু'জনেই নিরাবরণ। বলা হয়ে থাকে গ্রিকেরাই প্রথম বীরত্বের সঙ্গে নিরাবরণ পৌরুষের কল্পনা করেছিল। তারই প্রমাণ ভাস্কর্যে পুরুষের নগ্নমূর্তি। সেযুগে গ্রিসে ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ হত নগ্নাবস্থায়। যৌন উত্তেজনা ছিল দুর্বলতার লক্ষণ। তাই পুরুষাঙ্গ সবক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র। Gymnasium শব্দটাও এসেছে প্রাচীন গ্রীক শব্দ Gymnos থেকে, যার অর্থ নগ্ন। দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা ভারতবর্ষেও গ্রীক প্রভাবের ফল। তাই বহুবলী গোমতেশ্বরকেও পাওয়া শিল্পীর কল্পনায় নগ্ন অবস্থায়। ২০০৭ এর ৩১ জুলাই টাইমস অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে গৃহীত এস. এ. এস. জনমতে বিশ্বে বৃহত্তম মনোলিথিক স্কাল্পচার হিসেবে গোমতেশ্বরের এই মূর্তিটি ভারতের সপ্ত আশ্চর্যের প্রথম স্থান পায়।

রোমান ফোরাম

মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে যে সকল স্থান কালজয়ী ভূমিকা নিয়েছে সেসব জায়গায় উপস্থিত হলে মনের মধ্যে একরকমের শিহরণ জাগে। ফ্লোরেন্সের মুখ্য ক্যাথিড্রাল সান্টা মারিয়া ডেল ফিয়োরের গিবার্ট সৃষ্ট অবিশ্বাস্য কারুকার্যময় ব্রোঞ্জের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তেমন রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। ১৪০০ থেকে ১৪২৪ সালের মধ্যে নির্মিত এই বিশ্ববিখ্যাত দ্বারটি। সমগ্র দরজাটিতে রিলিফ ভাস্কর্যে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে খ্রিস্টজন্মের নানা কাহিনি। এটি Gates of paradise নামে পরিচিত। মাইকেল এঞ্জেলো মুগ্ধ হয়ে এই নামকরণ করেন। অনেকের মতে এই দ্বার দিয়েই রেনেসাঁসের শুরু।

ডুয়োমো নামে পরিচিত এই

With Best Compliments From -

W&L

Willowood Chemicals Private Limited

A World-class (B+G+7 Stored) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

অসাধারণ ক্যাথিড্রালটি ফ্লোরেন্সে রোমান ক্যাথলিকদের মাদার চার্চ। ব্যাসিলিকা হিসেবে রোমানেস্ক রীতিতে আদিতে নির্মিত এই সৌধে পরবর্তীকালে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) গথিক ও আরও পরে (চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকে) লেগেছিল রেনেসাঁ শৈলীর ছোঁয়া। সুবিশাল লাল-নীল-সবুজ ও শ্বেতশুভ্র পাথরের এমন অফুরন্ত কারুকার্যের অলঙ্করণ বিশ্বে বিরল। বিশাল অষ্টকোণা কাপোলাটি (গম্বুজ) ইঞ্জিনীয়ারিং মার্ভেল। এই রেনেসাঁ মাস্টার পিসটির মূল স্থপতি সিয়েনা শহরের ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্টি। এই ডুয়োমো নির্মাণ শুরু ১২৯৬ সালে ও সম্পূর্ণ হয় ১৪৩৬-এ। রোমের প্যানথিয়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটি নির্মিত। বিশাল গম্বুজটি যাতে বিপুল পাথরের ওজনের জন্য ভেঙে না পড়ে শিল্পী তাই তার তলে অপেক্ষাকৃত ছোট ধাতব কাপোলা গড়েন। প্রাসাদ, রাজপথ, নিকাশি ব্যবস্থায় বিশ্বকে পথ দেখানো ইতালির স্বর্ণযুগের শুরুই এই কাপোলার মধ্য দিয়ে। ডুয়োমো প্রসঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলো রোমের সেন্ট পিটার গোম্বুজ নির্মাণে হাত লাগাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'I go to build a greater dome but not fairer one.'

কেবলমাত্র স্থাপত্যের নিরিখে এই অনুপম সৌধটিকে বিচার করলে নিতান্তই অবিচার হবে। এর অভ্যন্তরের কারুকার্য, ৭২০ বছর সময়কালের অসামান্য পাথরের ভাস্কর্য ও সর্বোপরি অসংখ্য ফ্রেস্কোর সমাবেশ এই হর্ম্যকে মহিমান্বিত করেছে। ১৪৬৯ সালে গম্বুজের শীর্ষে গিল্ট করা তাম্রগোলক এবং ক্রুশ জুড়ে দিয়েছিলেন ভেরোক্কিও। উচ্চতা ৩৭৫ ফুট। কাজটি সম্পূর্ণ করতে এই সব বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ শিল্পীরা নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, বিশেষ করে ৩৭০০০ টন পাথর আর ৪০ লক্ষ ইট তোলার জন্য। বেশ কিছু স্কেচ এঁকেছিলেন দ্য ভিঞ্চি স্বয়ং। অভ্যন্তরীণ গ্যালারির পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিলেন অনেকের সাথে মাইকেল এঞ্জেলোও। যথার্থভাবেই তা ছিল সৃষ্টি সুখের উল্লাস। তাম্র গোলকটি ১৬০০ সালের ১৭ই জুলাই বজ্রাঘাতে ভেঙে গেলে দু'বছর পর নতুন ও বৃহত্তর গোলক বসানো হয়।

নবজাগরণের এই অমূল্য রত্নটিকে যথাযথ ভাবে চাক্ষুষ করতে গেলে অভ্যন্তরের ৪৬৩টি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। টিকিট আগে থেকে কেটে না রাখায় এ যাত্রায় আমরা সেই সৌভাগ্য সুখ থেকে বঞ্চিত হলাম। বাইরে থেকেই রেনেসাঁর এই আইকনিক সিম্বলটিকে চাক্ষুষ করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হল।

ফ্লোরেন্সের কোন দ্রষ্টব্যই একে অপরের থেকে বেশি দূরে নয়। এশহরে যে মিউজিয়াম, চিত্রকলা, শিল্পসংগ্রহালয়ের সংখ্যা কতো তা বলা কঠিন। পুরো শহরটাই একটা খোলা জাদুঘর যেন। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় একটা ধারণা চালু আছে, বিশ্বের ৬০ শতাংশ শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নাকি ইতালিতে এবং তার অর্ধেক নাকি ফ্লোরেন্সে। এই উক্তি সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হলেও ফ্লোরেন্স তার দাবিদার হতেই পারে।

নিষিদ্ধ অটোমোবাইলের পাথুরে রাস্তায় বিচরণরত সারা বিশ্বের শিল্পভুক নরনারী। বিশেষ করে চোখে পড়ে জাপানী পর্যটকের দল। চিনাদের সংখ্যাও কম নয়। বিশ্ব পর্যটকের এহেন সমাবেশে এমন অংশগ্রহণ সেই সব দেশের সমৃদ্ধি সূচিত করে। চোখে পড়লো কিছু ভারতীয়ও। এক একটা দলকে নানাভাষী গাইড হাতে ধরে থাকা স্টিকে পতাকা নিয়ে চলেছে দ্রষ্টব্য থেকে দ্রষ্টব্যে। তাকে ঘিরে বাধ্য ছাত্রর মত চলেছে অনুগত অতিথিরা। কেউ গাইডের মনোযোগী শ্রোতা, কেউ দেখছে পথের দৃশ্য। একদম পিছিয়ে পড়া অশক্ত আথ্রাইটিস আক্রান্ত স্থূলাঙ্গিনীদের অবস্থা চোখে পড়ার মত। তারই মাঝে ভাগ্য বদলানোর পাথর বা অন্যান্য স্মারক বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙচঙে জালেবা পরিহিত সেনেগাল, গাম্বিয়া প্রভৃতি আফ্রিকান দেশ থেকে আসা কৃষ্ণাঙ্গরা। বাঙলাদেশি যুবকরা স্যুভেনীর ঠাসা কিয়স্ক নিয়ে বসে।

আমাদের লক্ষ্য সেনোরিয়া। বোঝাই যাচ্ছে ভুল রাস্তায় চলেছি। তাহোক ক্ষতি নেই। হঠাৎ বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে থেমে পড়ি এক রহস্যময়ী চবুতরায় এসে। কোথায় যেন পড়েছিলাম যেহেতু বাইরে লাইন নেই তাই কেবল উফিজি আর অ্যাকাদেমিয়া ছাড়া অন্যরা ফ্লোরেন্সে অদর্শনীয় ভাবা মূঢ়তার নামান্তর। একটা ছোট্ট দলকে এক ইংরেজি ভাষী গাইড বলছে ইউ হ্যাভ নট এক্সপেরিয়েন্সড দ্য ম্যানারিস্ট মুভমেন্ট আনটিল ইউ হ্যাভ সীন দিস চ্যাপেল। চার্চের নাম সান্টা ফেলিসিটা। এটি পেন্টার্মোস চ্যাপেল নামেও বিখ্যাত। সিরীয় গ্রীক বনিকদের হাতে নির্মিত ফ্লোরেন্সের প্রাচীনতম চার্চ ভাবা হয় এটিকে। জন্মকাল দ্বিতীয় শতক। এই ছোট্ট, অনাড়ম্বর, লাজুক, মুখচোরা চার্চটিকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা কঠিন যে এর অভ্যন্তরে পেন্টার্মোর (১৪৯৪-১৫৫৭) ফ্লোরেন্টাইন ম্যানারিজমের সর্বোত্তম কাজগুলো ঝুলছে।

ছবির এই শহরে আসার আগে কলকাতায় পণ্ডিত প্রশাসক প্রয়াত অশোক মিত্র মহাশয়ের লেখা 'ছবি কাকে বলে' বইটি পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে সহজে শিল্পবেত্তা বানিয়ে তোলা। কিন্তু বিষয়ের জটিলতা ও সেই সঙ্গে ক্লাসিক ধর্মী লেখার মর্ম সহজে উদ্ধার করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিই। অশোক মিত্র বা নারায়ণ সান্যাল হওয়া সহজ নয়। ফলে ফ্লোরেন্টাইন আর্ট এর কতটুকু অন্তরস্থ করা গেল সে চিন্তা থেকেই যায়।

পাশেই পিয়াৎসা সান্টা ট্রিনিটা। সংলগ্ন চার্চটিতে অবাধ ও নিঃশুল্ক প্রবেশাধিকার। অবশেষে পৌঁছলাম সিনোরিয়া চত্বরে। এই চত্বর সম্পর্কে বলা হয়, ফ্লোরেন্সে এসে এই চত্বর না দেখে যে চলে গেছে তাকে আবার ফিরে আসতে হবে। ১৪০০ সাল থেকেই এই চত্বরটি ফ্লোরেন্সের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। পুরো নাম পিয়াৎজা দেল্লা সিনোরিয়া। এই ধরণের পিয়াৎজা বা চত্বর ইতালির সব প্রাচীন শহরেরই অপরিহার্য অঙ্গ। মধ্যযুগের নগর রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরেই এমন জমায়েতের স্থানে ছিল কেবল সমাজের উঁচু তলার লোকেদের প্রবেশাধিকার। তাদের জন্য প্রচলিত ছিল গণতন্ত্র। এখনো পর্যটনের মরশুম তুঙ্গে ওঠেনি তবুও ঢল নেমেছে দর্শনার্থীর। একটি ফলক জানাচ্ছে ১৪৯৮ সালে সমাজ সংস্কারক ধর্ম প্রচারক স্যাভোনারোলাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল এখানে। মাত্র ক'দিন আগে দেখে আসা প্রাগের চার্লস স্কোয়ারের জন হুসের কথা মনে পড়ল।

এই ঐতিহাসিক চত্বরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক উচ্চমানের স্থাপত্য ভাস্কর্য। রয়েছে অনন্য সুষমা নিয়ে ভেসিও প্রাসাদ,

বিখ্যাত ল্যানজি মিউজিয়াম। যে অসাধারণ ভাস্কর্যটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখতে হয় সেটি হল ভাস্কর জিয়ামবোলোনার, 'রেপ অব দ্য স্যাবাইন উইমেন'। শিল্পকর্মটির গতিশীলতা, ছন্দময়তা, গোড়া থেকে শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত এর অনবদ্য সংস্থিতি (কম্পোজিশন) অভিভূত করে। অনেক শিল্পবেত্তার মতে ডেভিডের সঙ্গে এটিও সমান মর্যাদার দাবিদার। এটিও একখণ্ড পাথর কেটে সৃষ্ট। ভাস্কর্যটিতে দেখা যাচ্ছে একটি পুরুষ একটি নারীকে হাত দিয়ে উপরে তুলে আছে। দ্বিতীয় জন একপায়ে ভর দিয়ে নিচু হয়ে।

এই শিল্পকর্মটির বিষয়বস্তু রোম পত্তনের সমকালীন ইতিহাসকে রূপায়িত করেছে। রোম দখলের পর বহিরাগত রোমানরা বংশবৃদ্ধির জন্য দলবদ্ধভাবে নারী অপহরণ করতো। রেপ শব্দটা ল্যাটিন র‍্যাপটিও (Raptio) থেকে নেওয়া হলেও যৌনতামুক্ত করতে আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিডন্যাপিং শব্দটা চালু করেছে। এই ভাস্কর্য ছাড়া আরও একজন বেনভেনুতো সেলিনি ও তার পারসিউস এই জাদুঘরকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে।

ভেসিও প্রাসাদের বিশালত্বর সাথে মানানসই সমুদ্রর দেবতা নেপচুন। ফোয়ারায় ও গতিশীল অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান মহাকায় নেপচুন শিল্পকর্মটিও অসামান্য ধ্রুপদি সৌন্দর্য নিয়ে এই চত্বরে দণ্ডায়মান। এখানে নেপচুনের শিল্পী আম্মানাতি আর অন্যান্য দেবতা ও অশ্বের ভাস্কর জিয়ামবোলোনা।

এই অবিস্মরণীয় পিয়াৎজাকে আরো বর্ণময় করে তুলেছে পর পর কটি ভাস্কর্য। শ্বেত পাথরের আশ্চর্য সুন্দর এই মূর্তিগুলি হল ডেভিড (অনুকল্প) এবং বন্দিনেলিসের হারকিউলিস।

সকাল নটা থেকে ক্যাথলিক ইতালির শিল্প গোগ্রাসে গিলে চলেছি। এবার থামতে হবে। লম্বা দিন এখন এখানে। তৃষ্ণা মিটছে বিয়ার ক্যানে। এবার জুৎসই ইটারির খোঁজে হাঁটা। অবশেষে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্ট্রিটফুড কোর্টে কফি কুকিস খেয়ে বাসে রওনা হলাম আর্নো নদীর দক্ষিণ পাড়ে পিয়াৎসেল মাইকেল এঞ্জেলোতে। একশো মিটার উঁচু এই হিলকটি থেকে নদী ও সমগ্র ফ্লোরেন্সকে দেখা এক অসামান্য প্রাপ্তি। পাহাড়ি টাসকানির নিসর্গে অপরূপ ফ্লোরেন্স তার বিশ্ববিখ্যাত লাল ডুয়োমোকে কেন্দ্র করে অবস্থান করছে। এখানেও রয়েছে ডেভিডের অনুকল্প। মূর্তির তলে চারদিকে দিবা-রাত্রি ঊষা ও গোধূলির চারটি মূর্তি। সবটাই এঞ্জেলোর কল্পনায় বানানো। গোধূলির কনে দেখা আলোয় আর্নো চিকচিক করছে। ফ্লোরেন্সকে বিদায় জানানোর সত্যি এ এক উপযুক্ত লগ্ন। মার্ক টোয়েন কি এখানে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন 'To see the sun sink down, drowned on his pink and purple and golden floods, and overhelm Florence with tides of colour and turn the solid city to a city of dreams.'

ব্রেড, বাটার, দুধ, ডিম, লেটুস ইত্যাদি কিনে ঘরে ফিরতে হবে। সঙ্গী রন্ধনে পটু। আগেই দেখে নেওয়া হয়েছে ঘরে চিনি, কফি, সয়াবিন অয়েল ও মশলা মজুত আছে।

ভরপেট ব্রেকফাস্ট সেরে ও সেই সঙ্গে ফয়েল প্যাকে ড্রাই লাঞ্চ নিয়ে সোজা স্টেশন। পিসা তিন ঘণ্টার পথ। স্টেশন ছাড়তেই ধরা দেয় অলিভকুঞ্জ, কিয়ান্তি ওয়াইনের দ্রাক্ষাক্ষেত্র শোভিত ইতালির স্বর্গোদ্যান তাসকানি। প্রকৃতি এখানে দরাজ হাতে কেবল নিসর্গই বিলোয়নি, এই মাটিতেই লালিত হয়েছে দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, দান্তে, বোকাচ্চিও পেট্রার্কের মত শিল্পী লেখকেরা। আমরা চলেছি পিসা, গ্যালেলিও যে শহরের ভূমিপুত্র।

স্টেশন থেকে দু'কিলোমিটার দূরত্বে এক এবং অদ্বিতীয় পিসার টাওয়ার। কেমন ঝিম ধরা শহরের ছবি। বন্ধ বাজারের দোকানপাট। কিউরিও শপে বাঙলাদেশের বিক্রেতা। শহরের মধ্যেই গ্রাম্য প্রকৃতির ইতস্তত উপস্থিতি। এক সময় এসে গেল রিভার আর্নো। দু'পাড় বাঁধানো নদী-সংলগ্ন রাজপথ। ফ্লোরেন্সে প্রথম পরিচয় আর্নোর সঙ্গে। নদীকে এই পিসাতে অনেক বেশি সুন্দরী লাগলো। ফ্লোরেন্সের নাগরিক বৈভবে এই নদী যেন তার লাবণ্যপ্রভা প্রদর্শনের সুযোগ পায়নি। বলতেই হবে পিসা আর আর্নো দুজনেই এখানে একে অপরের পরিপুরক। নদী তার সর্বস্ব নিয়ে মিশে যাবে নিকট সমুদ্রে। হঠাৎই দূর থেকে চোখে পড়ে দণ্ডায়মান হেলানো টাওয়ার। এই কাম্পেনিল বা বেলটাওয়ারটির খ্যাতি রোমের কলোসিয়ামকেও যেন ছাড়িয়ে যায়।

ট্যুরিষ্ট লিটারেচারে বলা ছিল লুক্কা দেখে সেখান থেকে বিকেলে পিসা দেখার কথা। আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনাও ছিল তাই। কিন্তু লুক্কার বদলে সিয়েনাকে যুক্ত করায় মধ্যাহ্নের পিসাকে দেখতে হলো। ফ্লোরেন্সের মতো এখানেও ক্যাথেড্রাল, ব্যাপিস্ট্রি ও বেলটাওয়ার নিয়ে রোমানেস্ক রীতিতে গড়ে উঠেছে এক বিস্তৃত সবুজের মাঝে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই ক্যাথিড্রাল অব দ্য অ্যাসাম্পশন মেরী। অতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা এই ব্যাপিস্ট্রিটি। তিন খ্যাতকীর্তি শিল্পী এর নির্মাতা। মূল বাস্তুকার ছিলেন বুশচেটো, সম্মুখ ভাগের অলঙ্করণের শিল্পী বেইনাল্ডো এবং অভ্যন্তরের প্রস্তর অলংকরণের দ্বায়িত্বে ছিলেন গুলিয়েলমো। এদের সমাধিও এখানে। মূলদ্বারের দুটি পাল্লায় ব্রোঞ্জের কাজ বিস্ময়াবিষ্ট করে। ফ্লোরেন্সের ডুয়োমোর মত শহরের কেন্দ্রে না হওয়ায় পিসার এই ত্রিস্তরীয় ক্যাথিড্রালকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

পিসার টাওয়ারের শৈলী আয়তক্ষেত্রাকারের বদলে গোলাকার। রয়েছে ছোট ছোট গোল আর্চ আর কলাম। টাওয়ারে ২৯৪ ধাপ সিঁড়ি আছে। নির্মানের পর চোদ্দফুট হেলে হাজার বছর ধরে অবস্থান করছে এটি, যাকে ছাড়া পিসা শহর অর্থহীন। এর মাথা থেকেই গ্যালেলিও কামানের গোলা ও বুলেট ফেলে প্রমাণ করেছিলেন যে হালকা ও ভারী বস্তুর পড়ন্ত গতি এক। বিজ্ঞানের প্রগতিতে পালক জুড়লেও তাঁকে খোয়াতে হয়েছিল পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদটি।

লিনিং টাওয়ারকে বাদ দিলে পিসা পর্যটনের অন্যান্য আকর্ষণে দীন বলা চলে। টাওয়ার দর্শন সেরে আমরা এক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলাম— ভূমধ্যসাগর দেখতে হবে। কাছেই লিওরিয়ান সাগর তীরে বীচ মেরিনা। প্রায় চার কিলোমিটার ভুল পথ পায়ে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডে আসার সুফল হল পিসার গ্রাম্য অথচ আধুনিক প্রকৃতির সাথে পরিচিত হওয়া।

মেরিনাকে তেমন জনপ্রিয় বিচ বলে মনে হল না। মধ্যাহ্নের আলস্য নিয়ে বিশ্রাম করছে যেন ছোটখাটো মৎস্য বন্দরটি। বোল্ডার আর ধাতব লকগেটে সশব্দে প্রতিহত হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের এক একটি ঢেউ। নির্জন সাগরবেলায় স্নান সেরে উঠে আসছে এক প্রৌঢ় দম্পতি। এছাড়া ট্যুরিস্ট বলতে আমরাই কেবল দেখতে এসেছি পিসার এই মেরিনাকে। তেমন কোন দোকানপাটও চোখে পড়লো না। সময় নষ্ট না করে বাসে ফিরি স্টেশনে। সেখান থেকে সিয়েনা যখন এলাম বিকেল পাঁচটা।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই সিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়। সোজা ঢুকে প্রথমেই এক সুদর্শন মধ্যবয়সী পুরুষের দেখা পেলাম। কার্যালয়ে বসে কাজে ব্যস্ত ছিলেন ভদ্রলোক। বললাম, আমাদের হাতে তিনঘন্টা সময় আছে। ভারত থেকে এসেছি। এই সময়টুকুতে আপনি আমাদের সিয়েনার কোন দ্রষ্টব্য দেখতে বলবেন? অল্পক্ষণ ভেবেই ভদ্রলোক বললেন পিয়েজ্জা দেল ক্যাম্পো দেখতে। সেই সঙ্গে পথও বাতলে দিলেন।

নির্দিধায় ভদ্রলোকের কথামত হাঁটা লাগালাম। অভিজাত এলাকার সুপরিচ্ছন্ন রাস্তা ক্রমশ এক পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠেছে। দু'ধারে প্রাসাদোপম অট্টালিকার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া। অনেকটা যাওয়ার পর দূরে শহরের স্কাইলাইন দেখে বোঝা গেল অনেকটা উঁচুতে উঠেছি। পথচারী স্থানীয় লোকেদের কাছে দেল কাম্পোর পথ নির্দেশ নিয়ে জানা গেল স্টেশন থেকে তার দূরত্ব ছ'কিলোমিটার। ক্রমশ আমরা ওল্ড টাউনে এসে গেলাম। মিলে যেতে লাগল পাদুয়ার দম্পতিটির বলা মেডিয়েভাল রোমান পারিপার্শ্বের বর্ণনা। যে কোন নগরীর প্রকৃত পরিচয় পেতে গেলে তার পুরনো অংশে যেতেই হবে। এক চৌরাস্তার কোণে দুই শিশুর নেকড়ের স্তন্যপানের ভাস্কর্য। কথিত আছে রোমুলাস ভাইয়েরা নাকি এক মা নেকড়ের মাতৃত্বে বড় হয়ে রোমের পত্তন করে। মনে মনে ভাবি এ ঘটনা কেবল ইতালি কেন আমাদের দেশেও বুলন্দসর শহরে ১৮৯৫ সালে দানা সেনেচারকে ইংরেজ অভিযাত্রীরা নেকড়ের বাৎসল্য থেকে উদ্ধার করেছিল। কিপলিঙ এর মুগলিকেই বা ভুলি কী করে?

অবশেষে এসে যাই সিয়েনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে। পেয়ে যাই আর্জেন্টিনীয় সেই তরুণ-তরুণীটিকে যাদের পিছনে কাল উফিজির লাইনে দীর্ঘ সময় দঁড়িয়েছিলাম। ওরাই দেখিয়ে দিল পিয়াজ্জার পথ। মনে মনে ইউনিভার্সিটির লোকটির সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ করলাম। এই অসাধারণ মুক্তাঙ্গনটি কেবল সিয়েনা বা ইতালিই নয় সমগ্র মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্যতম সেরা বলে বিবেচিত। এর অত্যুচ্চ টাওয়ার ও তার ভাস্কর্যময় সংস্থিতির ভুবনজোড়া খ্যাতি। মনে মনে লুক্কাকে হারানোর জন্য খেদ ছিল। এই মুহূর্তে পিয়াজ্জা দেল কাম্পো। তার

লেখক দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বিশাল লাল ইটের বাঁধানো চত্বর ও এক প্রান্তে আকাশ ছোঁয়া বেল টাওয়ারের ঔদ্ধত্য নিয়ে জানিয়ে দিল সিয়েনা কেন সে যুগে এক শক্তিশালী নগর রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছিল।

এ যেন বিশ্বের বৃহত্তম শানবাঁধানো সিটিসেন্টার তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের মিনি সংস্করণ। ভিড় যতই হোক কখনোই তা পর্যটকের স্বাচ্ছন্দে বিঘ্ন ঘটাবে না। এক উপভোগ্য ঢালে চারদিক থেকে মাছের কাঁটার আকারে গড়ে ওঠা এই উন্মুক্ত চবুতরাটি ১৩০০ শতকের আগে চারদিকে পাহাড়ি ঢালের মিলিত বিন্দু ছিল। গড়ে উঠেছিল বাজার। ১৩৪৯-এ এটি বাঁধানো হয়। এর নয়টি শ্রেণীর বিন্যাস বুঝতে গেলে সুউচ্চ টাওয়ারে উঠতে হবে। এই বিশাল অঙ্গনকে ঘিরে রেঁস্তোরা, পানশালার ছড়াছড়ি। একপ্রান্তে ভাস্কর্যমণ্ডিত ফোয়ারার মকরমুখে পানীয় জলের ব্যবস্থা। পায়রার ঝাঁকে শিশুদের আনন্দময় কোলাহল। যুবতীর কোলে যুবকের মাথা রেখে শুয়ে থাকা দেখলে মনে হতেই পারে ভেরোনার অলিন্দ ছেড়ে সদ্য আসা রোমিও জুলিয়েট। বয়স্ক চরণিকের পানীয় হাতে চিন্তামগ্ন অবস্থান সব মিলিয়ে যেন এক মধ্যযুগীয় কার্নিভালের ছোঁয়া। এই পিয়াজ্জা থেকে এগারোটি সঙ্কীর্ণ পাথুরে পথ বিচ্ছুরিত হয়েছে শহরের মধ্যে। প্রতিটি পথের দু'পাশে মধ্যযুগের রোমান সাম্রাজ্য যেন থেমে আছে। ইচ্ছে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাটাই। কিন্তু উপায় নেই। আহ্নিক গতির গর্ভে ফিরতে

With best compliments from: -

PIONEER PAPER CO.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,

ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩

২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,

কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

হবে ফ্লোরেন্সের আবাসে।

ফ্লোরেন্স রেলস্টেশনে যখন নামলাম রাত দশটা বেজে পনেরো। স্টেশন সংলগ্ন সুপার মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে। ফ্রিজে দুধ, ডিম থাকলেও ব্রেড কিনতে হবে। হস্টেলের কাছেই খোলা পেলাম একটা দোকান। কী করে জানি না দোকানিদের ইংরেজি উচ্চারণে হিন্দি-উর্দুর ছোঁয়া অনুভূত হল। ঠিক তাই, কথায় কথায় জানা গেল দশাশয়ী দোকানি দুইভাই পাকিস্তান থেকে আসা। নিমেষে কথাবার্তায় এসে গেল হিন্দি। ভারতীয় পেয়ে তারাও বেজায় খুশি। জানালো ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্টদের কাছে তাদের দোকান সব সময় একটা বড়ো ডেরা। ব্রেডের সাথে দু'বোতল জল বিনা পয়সায় দিয়ে দিল দুইভাই। এহেন অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। লন্ডনে সেই পাকিস্তানি ট্যাক্সি ড্রাইভারের আমার থেকে কেবল ভারতীয় বলে এক পাউন্ড কম ভাড়া নেওয়ার কথা, 'এক টুকরো ইউরোপে' লিখেছি। বিদেশে এহেন অভিজ্ঞতা এক অন্যধরনের সুখানুভূতি আনে।

Oh Rome ! My Country ! City of the soul.

– Lord Byron

মধ্যযুগের এই ইউরোপীয় নবজাগরণকে কয়েকশো বছরের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দৈবলব্ধ ছিল না এই রেনেসাঁ। এমন নয় যে ১৫০০ শতকের এক ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিজের তৈরি বালিঘড়ির (hour glass) দিকে তাকিয়ে লিওনার্দ বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য রেনেসাঁস এসে গেছে। পারসি গণিতজ্ঞ আল খোয়ারিজিমি (৭৮০-৮৫০) আবিষ্কৃত আলগরিদম এর মতো মধ্য এশিও আবিষ্কারগুলিও ইউরোপিয় রেনেসাঁসে জ্বালানি জুগিয়েছে। অন্যদিকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার পুড়িয়েছে ধর্মান্ধ খ্রিস্টান জিলাট। প্লেটোর আকাদেমি বন্ধ করে দেয় রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ান। আকাদেমির নেস্টরিয় গ্রিক পণ্ডিতরাই বৌদ্ধ সাসানিয় রাজা প্রথম শাপুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইরানের গোন্দেশাপুরে তৈরি করে মেডিকেল কলেজ। অন্য ধর্ম বিদ্বেষী পাপাল যুগের বিজ্ঞান বিরোধিতা গ্যালেলিওর যুগেও শক্তিশালী ছিল।

আমরা এই রেনেসাঁর গর্ভগৃহ থেকে রোমে এসেছিলাম ৯ জুনের উষ্ণ মধ্যাহ্নে। আইফোন জানাচ্ছে রোমের টার্মিনি স্টেশন থেকে পিয়াজা ডি কাপ্রিও চার কিলোমিটার দূরে। সেখানেই আমাদের যেতে হবে। রোমের টার্মিনি, ভিড়ে, জৌলুসে, আকারে আকর্ষণে অবশ্যই লন্ডন পারীর সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাতে পারে। মেপে নীচুস্বরে কথা বলা পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের তুলনায় কোলাহল এখানে অনেকটাই বেশি। জনশ্রুতি এরকম ঃ ইউরোপের ভূগোল যত পুবমুখি হয় শহরের কোলাহল তত বাড়ে। আমাদের ভারতবর্ষেও সেটা প্রমাণিত। পৃথিবীর কোন মেট্রো স্টেশনে তারস্বরে টিভি চলে না। কলকাতায় চলে। শব্দদূষণের বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়ানো ব্যস্ত রাস্তার চার মাথার মোড়ে স্থূল উদ্ভট চিন্তা প্রসূত রবীন্দ্র সঙ্গীতের আদিখ্যেতা সর্বশেষ সংযোজন। মুম্বই, দিল্লী, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এমনকী ভুবনেশ্বর থেকেও এলে কলকাতাকে তাই নাদব্রহ্মের কেন্দ্র মনে হয়।

রোমযাত্রী মাত্রই পকেটমারের আতঙ্কে ভোগে। আমরাও তার ব্যতিক্রমে নেই। স্বভাবতই সতর্কতা বাড়ে। কবল্‌ড রোডে শব্দ তুলে ধাবিত হই হুইল্ড লাগেজ নিয়ে গন্তব্যের দিকে। দু'ধারে চলে যাচ্ছে একের পর এক প্রাসাদোপম হর্ম্য। পার হচ্ছি এক একটা স্কোয়্যার ও সরণিগ্রন্থি। এক সময় উপস্থিত হই চিত্তাকর্ষক প্রাসাদের সামনে। এর আগে এমন রাজকীয় বিশালত্বের দাবিদার কোনো শ্বেতপাথরের প্রাসাদ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্যই এটি রোমের সেরা দশ দ্রষ্টব্যের একটা হবে। এহেন শহরকে প্রথম দর্শনজনিত এক আত্মহারা প্রগল্‌ভতা অনেককেই গ্রাস করে ও সেই সঙ্গে এক ধরনের স্যাডিজম্ দেয়। কজনেরই বা অন্নদাশঙ্করের মত বলার সৌভাগ্য হয়, 'এ শহরতো আমারই। তাই তার আবরণ ধীরে ধীরে খুলবো' (উক্তিটি লন্ডনকে নিয়ে করা)। বিশ্বের চিরন্তন নগরী রোমকে মাত্র চারদিনের জন্য পাবো। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব তার সৌন্দর্যের সন্ধান করতে হবে। তাই তার গোপন অঙ্গে তিলের সন্ধানের প্রশ্নই আসে না। তবে বহিরাঙ্গের জ্যোতির ছটার ছিটেফোঁটা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেলাম যখন অতিক্রম করলাম পিয়াজ্জা ভেনেসিয়া। একে একে এ শহর যেন নিজেই নিজেকে মেলে ধরে জানাচ্ছে কেন অনেকে তাকে ইউরোপের সবচেয়ে 'ম্যাগনিফিসেন্ট' শহর বলে।

A heady mix of haunting ruins, awe inspiring art and vibrant street life এর শহর রোম। এসে যায় পিয়াজা ডি ক্যাপ্রিও। পিয়াজ্জা জুড়ে বাজার বসেছে। মশলা থেকে সব্জি, ছবি, পোষাক, চিজ, পাস্তা, ফুল কী নেই। বিক্রেতাদের অনেকেই বাঙলাদেশি টানে বাংলা বলছে। ঢুকে পড়ি কয়েকটা পাথুরে ইমারতের মাঝখানের সরু গলির মধ্যে। যেন বাগবাজারের কোন রাস্তা। পৌঁছে যাই গ্রীন ফ্লাওয়ার গেস্ট হাউসের সামনে। এটাই হবে আমাদের রোমের ভদ্রাসন। গেট বন্ধ। ফোন করলে এক মহিলা কণ্ঠ জানালো এক্ষুণি সে আসছে। তার আসতে বিলম্ব হওয়ায় পাশের ইটারির তরুণী ডেকে তার দোকানে বসালো। আমাদের চোখেমুখে ফ্লোরেন্স থেকে আসার ও গরমের ক্লান্তি স্পষ্ট। দু'জনে দু'ক্যান বিয়ার পান করছি এমন সময় ছোট্ট ফুটফুটে কন্যাকে নিয়ে এসে গেট খুলে স্বাগত জানালো ছোট্টখাট্য তার মা। পরনে সাদা সর্টস আর গোলাপী স্যান্ডো গেঞ্জীর ল্যাটিন মহিলাটি পেরু থেকে আসা। দেখলে আর্লি টিনএজার বলে ভ্রম হবে। সোফায় বসিয়ে সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে গেল ঘর প্রস্তুত করতে। আমাদের ব্যবস্থা হল বেসমেন্টে অর্থাৎ মাটির তলায়। ঘরটা বেশ বড়। পাথরের দেওয়াল। ওঠার সিঁড়ির তলায় অপরিসর টয়লেট। পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি নেই। জানালো স্নানের জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরের বড় ওয়াশরুম ব্যবহার করতে পারবো। কিচেন ও চা কফির আয়োজনও সেখানেই।

ইতালি নাকি ভূকম্প প্রবণ দেশ। ক'মাস আগে রোমেও মৃদু ভূকম্পের খবর কাগজে বেরিয়েছিল। সেই শহরেই ভূগর্ভে বাস করতে হবে। তেমন কিছু ঘটলে আমাদের খবর কেউ পাবে না। তা হোক, রোম প্রবাসের রোমাঞ্চে এ-এক নতুন মাত্রা জোগাবে।

কলকাতায় আমাদের যাত্রা শুরুর আগে রোমকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি পর্যটন পরিকল্পনা করেছি। ইউ টিউবে একাধিক ভিডিও থেকে গিবনের ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল্ অফ দ্য রোমান এম্পায়ার কিছুই বাদ

যায়নি। রোম মানুষকে পাগল করে দেয়। এত তার সম্পদ, কোনটা কখন দেখবো, কোনটা বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, এসব নিয়েই দিনের পর দিন কেটেছে।

ট্যুরিস্টের সুবিধার জন্য রোমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। ইম্পিরিয়াল, মনুমেন্টাল আর রেলিজিয়াস বা ভ্যাটিকান। আমাদের অবস্থান থেকে দুটো দ্রষ্টব্য একেবারেই কাছে। এগুলো হল প্যানথিয়ন আর পিয়াৎসা নভোনা। এ-শহরে কিছু শব্দ সহজেই জানা হয়ে যায়, যেমন বড় সরণি হল ভিয়া। চারিদিক বড়ো সৌধে ঘেরা মিলনক্ষেত্র হল পিয়াৎসা। একই ভাবে পালাৎসো অর্থ প্রাসাদ।

প্যানথিয়ন দিয়েই শুরু করলাম আমাদের আনুষ্ঠানিক 'রোমান হলিডে' উদ্‌যাপন। এটি প্রাচীন রোমের এক বিস্ময়। এ-নগরীর প্রাচীনতম মনুমেন্ট যা আদিতে ছিল রোমান দেবতাদের দেবালয়। খ্রিঃপূঃ ২৭ সালে অগাস্টাসের সেনাধ্যক্ষ অ্যাগ্রিপা এটি নির্মাণ করেন। আমাদের দেশে আবিষ্কৃত মনুষ্য নির্মিত প্রাচীনতম প্রস্তর স্থাপত্যটি হল সাঁচির স্তূপ (৩০০ খ্রিঃপূঃ)। আশি খ্রিস্টাব্দে প্যানথিয়ান আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডোমিটিয়ান পুনরায় নির্মাণ করেন। পরে ১১০ খ্রিস্টাব্দে বজ্রাঘাতে পুনরায় আহত পবিত্র উপাসনালয়টি ১২০ সালে গ্রিক স্থপতি দামাস্কাসের সাহায্য নিয়ে হাড্রিয়ান গড়ে তোলেন।

গোলাকার এই মন্দিরটির সামনের পোর্টিকোকে দু'সারিতে বারোটি করিন্থিয়ান কলাম ধরে আছে। ওপরে রয়েছে ত্রিকোণ পেডামেন্ট। তার তলায় ল্যাটিনে লেখা, M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIUM, যার অর্থ It was built by Marces Agrippa in his third consulate. মুগ্ধ মাইকেল এ্যাঞ্জেলো প্যানথিয়ন দেখে বলেছিলেন It looks more like the work of angels, not human. সত্যিই এর একাধারে সামঞ্জস্য, সমন্বয়, বিজ্ঞান ভাবনায় সর্বার্থসাধক সৌন্দর্য যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করে চলেছে। অবাক করা সেই সময়কার তৈরি ব্রোঞ্জের দরজাটি এখনো প্যানথিয়নের মূল প্রবেশদ্বার।

প্যানথিয়নের সামনেই রয়েছে একটি ইজিপসিয়ান ওবেলিস্ক। ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্সের চেয়েও বড় এখানকার ডোম তথা গোম্বুজটি ১৩০০ বছর ধরে বিশ্বে বৃহত্তম ছিল। আজও এটি বৃহত্তম স্তম্ভহীন গম্বুজ। এই মন্দিরের মেঝে থেকে শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব আর গোলাকার ডোমের ব্যাস অভিন্ন। দুটিই ৪৩.৫ মিটার। গম্বুজের বেধ উপর দিকে ক্রমশ কমেছে। প্যানথিয়নের অন্যতম আকর্ষণীয় অংশটি হল ছত্রাকার সিলিং এর মধ্যস্থ ফাঁকা গোলাকার জায়গাটা। এটিই হলের ভিতর আলো ও বাতাস ঢোকার একমাত্র পথ। জল পড়লে মেঝের ঢালে মুহূর্তকালে অপসৃত হয়। প্রতিবছর ২১ এপ্রিল দুপুর বারোটায় সূর্যালোক ব্রোঞ্জ কপাটের গ্রিল ভেদ করে সমগ্র প্রাঙ্গণকে আলোকিত করে। এই দিনটি রোমের প্রতিষ্ঠা দিবসও।

ভিতরের গোলাকার হল ঘরটি ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে সাজানো। স্তম্ভ ঘেরা রয়েছে সাতটি কুলুঙ্গিতে। অতীতে এগুলোতে নানান রোমান দেবদেবীর মূর্তি ছিল। পোপের শাসনকালে এটি মেরিকে উৎসর্গীত চার্চে পরিণত করা হয়। এই ধরণের প্রয়াসে ইতালির সাথে আমাদেরও মিল আছে। সম্প্রতি পুনা কেন্দ্রীক অষ্ট বিনায়ক দর্শনে গিয়ে দেখলাম নেলাদ্রি পাহাড়ে ১৮টি বৌদ্ধ গুহার বুদ্ধদেবকেও গণপতি মোরিয়া বাপ্পার জন্য চলে যেতে হয়েছে।

প্যানথিয়নে কোন প্রবেশমূল্য নেই। এর পবিত্রতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বর প্রতি এখানকার নগরপালিকা ও সরকার যারপরনাই সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল। চিত্রকর রাফায়েল ও ভিক্টর ইমানুয়েলের মত ঐতিহাসিক পুরুষকে তারা এখানেই সমাধিস্থ করেছে। সাঁচি বা মাউন্ট আবুর দিলওয়ারার মত প্যানথিয়ন দর্শনও বোধ ও চিন্তার ঐশ্বর্যকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করে। অনেকে বলে গ্রিসের পার্থেননও এমন অনুভূতি দেয়। এটা বলতেই হবে ইতিহাস এবং স্থাপত্যে অনাগ্রহী মানুষের রোম দেখা অনুচিত।

রোম দর্শনের প্রাথমিক ধাক্কা নানা চিন্তার জন্ম দেয়। পণ্ডিতেরা বলেন পৃথিবী নিজেই তো পৃথিবীর প্রতি ইউরোপের দান। কারণ পৃথিবী ইউরোপের আবিষ্কার। পৃথিবী আবিষ্কারের নেশায় তাড়িত কেউ হল না রোমকদের মতো। আমাদের অবস্থা তো আরো করুণ। গুপ্ত যুগের পর যেন কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল বেদ উপনিষদই নয়, নালন্দা, পাহাড়পুর, বিক্রমশীলা ছিল কোন সপ্তম শতকে। ইউরোপ তখন কোথায়? কথায় আছে When Greece was in its glory, Germans and saxons were hunting wild boar. গ্রিসের সঙ্গে ভারতকেও যোগ করা যায়। মধ্যযুগের শুরুতে যখন বক্তিয়ার খিলজী নালন্দা পাহাড়পুর ধ্বংস করছে তখন বোলোগনা পাদুয়ার জন্ম হচ্ছে। অনেক পরে ইউরোপ এসে কলকাতাকে এথেন্স বানাবার চেষ্টা করলেও স্বাধীনোত্তর কালে বক্তিয়ার খিলজীর নব অবতাররা ইংরেজী ও নবপ্রযুক্তির বিরোধিতা করে ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটাকে বিপরীত পথে চালিত করল। পৃথিবীর আকার আকৃতি গতি ও অবস্থান ইউরোপই আমাদের জানালো। আমরা মেতে থাকলাম পরলোকের নাড়ি নক্ষত্র নিয়ে।

প্যানথিয়ন থেকে পিয়াৎসা নভোনা বেশি দূরে নয় তবুও ওই স্থানটি বিকেলের জন্য রেখে চললাম অন্য পথে। রোমে দ্রষ্টব্যস্থানের ছড়াছড়ি। মাসখানেক কাটালেও সব দেখা কঠিন। সর্বোপরি শহরের যে বৃত্তের মধ্যে এগুলো অবস্থিত সেটা গোবিন্দপুর-কলিকাতা-সুতানুটির মিলিত আয়তনের চেয়ে কিছুটা ছোটই হবে। তাই পায়ে হেঁটেই রোমকে আবিষ্কার করা ভালো। এ শহরের মতো চোখ কান মন খোলা রেখে বেড়ানোর সুখ কোথায়? রোমের অগুন্তি প্রাসাদের অনেকগুলিই এখনো ব্যক্তি মালিকানায় আছে যারা কখনো না কখনো এই ঐতিহাসিক নগরীর কোন না কোন শাসকের বংশধর। এগুলো বড়ো একটা পাঠকের আইটিনারিতে থাকে না। এসে গেলাম সেই বিখ্যাত প্রাসাদের সামনে, আগের দিন আসার পথে যেটা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এটি ভিক্টর ইমানুয়েলের স্মৃতিতে নির্মিত। পায়ে হেঁটে রোমে ঘুরলে এই প্রাসাদ আর পিয়াৎসা ভেনেসিয়া বার বার ছুঁতে হয়। কাছেই পালাৎসো ভেনেসিয়া। এখান থেকেই মুসোলিনী ভাষণ দিতেন। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। ১৯২৫ ও ১৯২৬-এ দু'বার তিনি ইতালি ভ্রমণ করেন। প্রথমবার মিলানে বক্তৃতা সফর ছিল। দ্বিতীয়বার খোদ রোমে তিনি ছিলেন স্বয়ং মুসোলিনীর রাজ-অতিথি হয়ে। স্বৈরশাসক শান্তিনিকেতনে দুই প্রতিনিধির হাত দিয়ে কিছু

মূল্যবান বই পাঠিয়ে কবিকে রোম সফরের আমন্ত্রণ পাঠান। ৩০মে থেকে ২২ জুন, ১৯২৬ কবি এই সফরে নেপলস হয়ে বিশেষ ট্রেনে রোমে যান। রোমের সেরা হোটেলে তিনি ১৪ দিন অবস্থান করেন। তাঁর সাথে পরের জাহাজে রওনা হয়ে মিলিত হন সস্ত্রীক অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ। রানিমা-র (নির্মল কুমারী মহলানবিশ) কাছে আমি শুনেছি কবি কেমন ভাবে নজরবন্দি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সপরিবারে রথিঠাকুর। অধ্যাপক কার্লো মরমিচি রোমে রবীন্দ্রনাথের পুরো দায়িত্ব নিয়ে নেন। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। এমনটাই হয়েছিল এযুগে মারাদোনার সঙ্গে প্রয়াত জ্যোতি বসুর সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে। একটি দম্পতি ছাড়া কোন সাংবাদিকেরও প্রবেশাধিকার ছিল না।

মুসোলিনীর উপস্থিতিতে কবিকে এক বিশাল প্রেক্ষাগৃহে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার দর্শক সমাগম হয়। কবি তাঁর ভাষণে বলেন যে ভূমিতে শেলী, কিট্স, বায়রন, ব্রাউনিং এর মত প্রতিভা সমৃদ্ধ করেছে সেখানে আসতে পেরে তিনি ধন্য। পরদিন সংবাদপত্রে এই ভাষণকে ইতালীয় ভাষায় মুসোলিনীর স্তুতির কাজে পরিবেশিত হওয়ার ঘটনা প্রশান্তচন্দ্রের নজর কাড়লে কবির দেশে ফেরার ব্যবস্থা নাকি দ্রুত করা হয়। এই কারণেই কবির রোম দর্শন অসম্পূর্ণ ও ফ্লোরেন্স অদেখা থেকে যায়।

ভিক্টর ইমানুয়েলকে ডানহাতে রেখে রোমের প্রধান রাজপথ ভিয়া ইম্পিরিয়ালি ধরে পূর্বদিকে কয়েক কদম এগিয়েই দূরে চোখে পড়ল কলোসিয়ম। বিশাল চওড়া এ-রাজপথ যেন জানিয়ে দিচ্ছে সেই বহু কথিত বাক্যটিকে অল রোডস লিড টু রোম।

চলার পথে এসে যায় বৃত্তাকার এক সুউচ্চ মনুমেন্টাল ইমারত। দেখেই মনে হয় অতিপ্রাচীন স্থাপত্য। সামনেই ছোট্ট টুলে বসে নিবিষ্ট চিত্তে বেহালা বাদনরত এক শিল্পী। সামনে তার খোলা ভায়োলিন বক্সে কিছু খুচরো কয়েন। তার থেকে কিছুটা ব্যবধানে একমনে ছবি আঁকছে একজন। তার কাছে এই প্রাচীন দুর্গ সদৃশ বিল্ডিংটির পরিচয় জানতে চাইলে শিল্পী বলল ক্যাসেল সন্ত এ্যাঞ্জেলো। তার পরেই লোকটি প্রশ্ন করল 'ফ্রম ইণ্ডিয়া'?

চমকে উঠি। প্রৌঢ়ত্ব যাই যাই, সুঠাম স্বাস্থ্য, এক গাল শ্বেতশুভ্র গোঁফ দাড়ি ও বিরল কেশ, অবিকল সত্তরের দশকের প্রতিবেশী শিল্পী প্রকাশ কর্মকার। পরিচয় হল, একদা জম্মুর বাসিন্দা সর্দার সিং। ২৬ বছর ধরে ইতালিতে ছবি আঁকছে। রাত আটটায় কলোসিয়ামের পাশে চারটে ফ্লাশ লাইট নিয়ে বসে। তার ভাষায়, ইতালিতে সবাই যেভাবে জীবনটা উদ্‌যাপন করে আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। কোন ভয় নেই। এখানে সব কিছু খোলা মনে মেনে নেয় সকলে।

সামনে বয়ে চলেছে নদী টাইবার। রাস্তা থেকে অনেক নিচে নদীর কিছুটা ওপরে সারিসারি রেস্তোঁরা, ছবির স্টল। ঢুকে যাই ক্যাসেলে। টিকিট কম নয়, মাথাপিছু চোদ্দ ইউরো, ভারতীয় মুদ্রায় ১০০৮ টাকা। বৃত্তাকার পথে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠি। সম্রাট হাড্রিয়ান ১২৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এটি দুর্গ ও এই ক্যাসেলে রূপান্তরিত হয়। একদা রোমের উচ্চতম এই বিল্ডিং ৪১০ সালে ভিসিগথদের দখলে গেলে কারাগারে পরিণত হয়। বর্তমানে মিউজিয়াম। এর নির্মাণ শৈলী থেকে প্রাচীন রোমের স্থাপত্য সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়। শীর্ষদেশ শহরের এক অসাধারণ দৃশ্য উপহার দিল। তিনশো ষাট ডিগ্রী কোণে বিহঙ্গ দৃশ্যে নদীর দু'দিকে রোমের অসংখ্য হর্ম্য, গীর্জাচূড়ো, পথঘাট ও সর্বোপরি ভ্যাটিকানে সেন্ট পিটার্সসের গম্বুজ ধরা দেয়। অন্যদিকে প্যালেটাইন আর ক্যাপিটোলাইন পাহাড় দুটি নিসর্গসহ দৃশ্যগোচর হয়। বিখ্যাত ইটালিয়ান চলচ্চিত্র 'এ্যাঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমনসের' দৃশ্যগ্রহণ হয় এই ক্যাসেল কাম মিউজিয়ামে। কতো শত বছর ধরে ঘটনায় ঠাসা টাইম ক্যাপসুল হয়ে অবস্থান করছে এই ক্যাসেল সন্ত অ্যাঞ্জেলো।

ক্যাসেল দর্শন সেরে উত্তরে এগিয়ে চলি। রোম প্রবাসের সবচেয়ে স্পর্শকাতর মুহূর্ত বলা চলে। একটি শহরের একই অঙ্গে এতো রূপ রোম না দেখলে বোঝা কঠিন। প্রাচীন রোম, পোপের রোম, আধুনিক যুগে মুসোলিনীর রোম ছাড়াও রেনেসাঁস, বারোক রোম। আবার ফেলিনি, মালদিনির রোমকেইবা ভুলি কি করে। আসলে রোম আমাদের এতোই চেনা যে এশহরের আনাচে কানাচে ঘুরলে এক 'deja vu' অনুভূতি দেখা দিতে বাধ্য।

রোমের অন্যতম প্রধান রাস্তা ভিয়া ডেই ফোরি ইম্পিরিয়ালির ওপর পর পর ট্যুরিষ্ট স্পটগুলি সাজানো। রাস্তাটি পুবে কলোসিয়াম থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে ভিক্টর ইমানুয়েল স্মৃতিসৌধে মিশেছে। মাঝে রয়েছে ক্যাসেল শীর্ষে সন্ত অ্যাঞ্জেলো এবং ক্যাথারিনার মতো দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য।

এসে যায় রোমান ফোরাম। শহরের মধ্যস্থলে তিন পাহাড়ে ঘেরা একদা জলাভূমিতে গড়ে ওঠে এই বিশাল অঞ্চলটি। শতাব্দীর পর শতাব্দী দিগ্বিজয়ীর শোভাযাত্রা থেকে বক্তৃতার মঞ্চ, অপরাধীর বিচার থেকে গ্ল্যাডিয়েটরের শৌর্য-নৈপুণ্য। মন্দির, দোকানপাট, বাজারসহ এই ফোরামই ছিল রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রসাশনিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। এখানে আসার আগে এর বিশালত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। রোম আর তার ফোরাম সমার্থক।

রাজপথে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ফোরামকে ভাঙা পাথরের স্তূপের বেশি কিছুই মনে হয় না। বিশাল বিশাল স্তম্ভ, আংশিক ভাঙা পেডামেন্ট, মন্দিরের গম্বুজ ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ দেখে ফোরামকে বোঝা যায় না। এর প্রকৃত রসাস্বাদ করতে গেলে কয়েকদিন কেটে যাবে। এখানকার প্রতিটি পাথরে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস মিশে আছে। ফোরি ইম্পিরিয়ালির প্রবেশ স্বারে জুলিয়াস সিজারের পূর্ণবয়ব প্রস্তরমূর্তি।

দু'হাজার বছর আগে এখানে ঘটেছিল এক ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড। এখানকার এ্যাসেম্বলি হলের মুখে পরাক্রমশালী রোমান নায়ক জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করেছিল তেইশ জন সেনেটর। প্রিয় অভিজাত ব্রুটাশকে উদ্দেশ্য করে মৃত্যুকালীন সিজারের শেষ উক্তি Et too Brute রোমের সেই উত্তাল সময়কে নাটকের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন মহাকবি সেক্সপিয়র। ফোরাম মানেই সিজার, সিজার মানেই ফোরাম।

সিজার (খ্রিঃপূঃ ১০২-'৪৪) ছিলেন বহু গুণের অধিকারী-বুদ্ধিমান, সাহিত্য-প্রেমী, বাগ্মী। সম্ভ্রান্তবংশীয় হয়েও

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA)
PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

প্লেবিয়ান বা সাধারণ মানুষের পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। চল্লিশোর্ধ সিজার গল অভিযানে নিজেকে ইতিহাসের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ প্রমাণ করেছিলেন কোনরকম পেশাগত প্রশিক্ষণ ছাড়া।

সেনাপতি হিসেবে পম্পেও ছিলেন অসাধারণ। সিজার গিয়েছিলেন পশ্চিমে, পম্পে গিয়েছিলেন পুবে। সিরিয়া ও পারস্য জয় তাঁরই সাফল্য। সিজারের অনুপস্থিতিতে পম্পে যখন একাধিপত্য কায়েমে তৎপর তখনই গল বিজয় সেরে সিজার ফেরেন। সে সময় নিয়ম ছিল বিদেশ থেকে যুদ্ধ শেষে যোদ্ধা উত্তরে রুবিকন নদী পর্যন্ত আসতে পারবে। রোমে ঢোকা নির্ভর করতো সম্রাটের ইচ্ছার ওপর। সিজার এই নিয়ম না মেনে পম্পের সেনাদলকে পরাস্ত করলে পম্পে গ্রিসে পলায়ন করে। সিজার সেখানেও তাকে পরাজিত করলে পম্পে মিশরে গেলে সিজার সেখানে ধাওয়া করে পম্পেকে হত্যা করেন। সেটা খ্রিঃপূঃ ৪৮ সাল। পরবর্তী অধ্যায়-মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা-সিজার প্রণয় পর্ব। তাঁদের পুত্র ছিলেন টলেমি সিজার। সিজার হয়ে উঠলেন রোমের অবিসংবাদী নেতা, তাঁর ভাষায় Veni, Vidi, Vici, এলাম দেখলাম জয় করলাম। ইউরোপের ইতিহাসে সিজার শব্দর জনপ্রিয়তা যুগে যুগে লক্ষ্য করা গেছে। রাশিয়ায় Czar, জার্মানীর Kaiser শব্দগুলোর উৎসই Caesar.

সিজারের মৃত্যুর পর রোমের রিপাবলিকে গৃহযুদ্ধ চলে কিছুকাল। অবশেষে ক্ষমতায় আসেন অক্টাভিয়ান বা অগাস্টাস (খ্রিঃপূঃ ৬৩-১৪)। রোম সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ইতিহাসে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বর্ণময়। প্রাচীন রোমান কবি ও লেখক ভার্জিল, হোরেস, লিভি ও ওভিড সকলেই তাঁর সমসাময়িক। অগাস্টাস জীবন সায়াহ্নে বলতেন, 'পেয়েছিলাম ইটের রোম রেখে গেলাম মার্বেলের রোম।' তাঁর রাজত্বকালেই ঘটেছিল আর এক যুগান্তকারী ঘটনা যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেছিল। বেথলেহেমে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মানবপুত্র। তাঁর জ্যোতির ছটা সর্বাধিক আলোকিত করেছিল যে ভূখণ্ডকে গত পক্ষকাল সেই ক্যাথলিক বিশ্বের সুধারস আকণ্ঠ পান করে চলেছি আমরা দু'জন।

ফিরে আসি ফোরামে। অগাস্টাসের মার্বেল খচিত রোমের কঙ্কালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে সেনেটের ভগ্নস্তূপ। প্রাচীন কমিটিয়াম। সেখানে রয়েছে রোমুলাসের সমাধি। সেনেটের ঠিক পাশেই আশ্চর্য সুন্দর অবস্থায় অবস্থান করছে বিজয়তোরণ। আসিরিয়া আর মেসোপটেমিয়ায় পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে সম্রাট সেপটিমিয়াসের যুদ্ধ জয়ের স্মারক। নির্মিত ২০৩ খ্রিষ্টাব্দে।

তোরণটির পাশেই উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো ঐতিহাসিক রোস্ট্রা। ফোরামের বক্তৃতা দেওয়ার জায়গা। মন চলে গেল সেই কলেজ জীবনে। ইংরেজির ক্লাসে জুলিয়াস সিজার পড়াচ্ছেন আর.পি.এস. (অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত) – পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করা সিজারের উক্তি, 'Cassius has a lean and hungry look, He thinks too much. Such men are dangerous. ....He is a great observer and he looks quite through the deeds of men. He loves no plays. As thou dost, Anthony, He hears no music, Seldom he smiles.' মনে পড়ে মার্ক অ্যান্টনির বিখ্যাত ভাষণ কিংবা ব্রুটাশের মুখে Not that I loved Caesar less, but I loved Rome more.

রোস্ট্রা কেবল বক্তৃতার জায়গাই ছিল না। এখানে টাঙানো হতো নানা সরকারি বিজ্ঞপ্তি। সিজার হত্যার পর এখানেই টাঙানো হয়েছিল হত্যাকারীদের নামের তালিকা যেখানে ছিল বাগ্মী ও পণ্ডিত সিসেরোর নাম। সিসেরোকে মার্ক অ্যান্টনির নির্দেশে হত্যা করে তাঁর মাথা ও ডানহাত কেটে এই রোস্ট্রাতে টানিয়ে রাখা হয়েছিল। অ্যান্টনির প্রজাপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিসেরো কলম ধরেছিলেন। এটা তারই পুরস্কার। জুলিয়াস সিজার বা রোমের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যুগে যুগে দেশে দেশে ঘটে চলেছে। এই ইতালিতে যেমন মুসলিনীর মৃতদেহকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনা ঘটেছে। তেমনই ঘটেছে চীনে অতিসম্প্রতি কারাবন্দি নোবেল জয়ী লেখক লিউ জিয়াবাওয়ের মৃত্যু, যা সলঝেনিৎসিন রচিত ক্যানসার ওয়ার্ডের বাস্তবায়ন বলা যায়। ঝিয়াবাও ও সিসেরোর মতো বলেছিলেন, The mentality of enmity can poison a nation's spirit.

ফোরাম যেন তার ইতিহাসকে সিন্দুক থেকে একটা একটা করে উন্মুক্ত করছে। হাতে ফোরামের চিত্র সম্বলিত তথ্য মিলিয়ে আবিষ্কার করি টেম্পল অফ স্যাটার্নকে, যা আজ সেনেটের দিকে মুখ চাওয়া একসার আয়নিক থাম মাত্র। এর বয়স এথেন্সের পার্থেননের কাছাকাছি। ক্ষমতায় এসে সিজার এই মন্দির থেকে নাকি পনেরো হাজার সোনার বার, তিরিশ হাজার রূপোর বার ও তিনশো কোটি মুদ্রা লুঠ করে দেশের আর্থিক অবস্থাকে সামাল দেন। দেবস্থানে সোনা বা মুদ্রা সবদেশেই সঞ্চিত হয়। ভারতবর্ষও ব্যতিক্রম নয়। কেবল জানা যায়নি গজনীর মামুদ বার বার সোমনাথের সম্পদ লুণ্ঠন করে কোন অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য এনেছিল। এযুগে অনেক ব্যাঙ্কের লোগোতেও এই ভেসপেসিয়ান তথা টেম্পল অফ স্যাটার্নের ছবি মেলে।

এই ফোরামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর এক শাসকের নাম। সেটি হল ক্যালিগুলা, যাঁর রাজত্বকাল মাত্র চার বছরের (৩৭-৪১ খ্রিস্টাব্দ)। তার পাগলামোর জুড়িমেলা ভার। তিনি ব্যাসিলিকার ছাদ থেকে সোনা রুপোর মুদ্রা ছুঁড়ে আনন্দ পেতেন। সেই মুদ্রা কুড়োতে গিয়ে নাকি ৩২ জন পুরুষ ও ২৪৭ জন নারী প্রাণ হারায়। একবার তিনি একটি ঘোড়াকে রোমের কনসাল পদে বসান। জীবিতকালেই নিজের পুজোর জন্য একাধিক মন্দির নির্মাণ করেন। রাজপ্রাসাদের সৈনিকদের হাতে ক্যালিগুলার মৃত্যু হয়।

ক্যালিগুলার পর রোমে ক্ষমতায় আসেন ক্লডিয়াস (৪১-৫৪ খৃঃ) তারপর নিরো (৫৪-৬৮ খৃঃ)। অন্ধ খ্রিস্ট বিরোধী নিরো নামটির সঙ্গে নিষ্ঠুরতা সমার্থক। সম্রাট আকবরের মতো অল্প বয়সে ক্ষমতায় বসলে তার বিমাতাই নাকি রোমের কার্যকর কর্ত্রী ছিলেন। পরে নিরো সেই ধাত্রীকেই হত্যা করেন। অপরিণত নিরোর ক্ষেত্রে বৈরাম খাঁ ছিলেন তাঁর শিক্ষক সেনেকা। নিরো ৬৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিস ভ্রমণে যান। গ্রিকরা ছাড়া কেউ সেই সময় প্রাচীন অলিম্পিকের আসরে অংশ নিতে পারতো না। তবুও তিনি অংশ নেন এবং সব ইভেন্টেই তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করার কারণে পরের বছরেই গ্রিসের স্বাধীনতা ঘোষণা

করেন। তিনি কুটনীতি, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী ছিলেন। এমনকি অভিনেতা, কবি, যন্ত্রী ও রথ চালকের ভূমিকায় অংশ নিতেন। তাঁর শাসনকালে রোমের অগ্নিকান্ড ও সেই সময় তাঁর বেহালা বাদনের কথা কার না জানা। এই অগ্নিকাণ্ডের প্রশ্নে একমত হলেও তাতে নিরোর ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮-১৯ জুলাই প্রথমে সার্কাস ম্যাক্সিমাসে আগুন লাগে এবং সাতদিন ধরে অগ্নিকাণ্ড চলে। ভয়াবহ এই অগ্নিকান্ডে অসংখ্য গৃহ, নাগরিক বসতি, মন্দির ভস্মীভূত হয়। প্লিনি (অগ্রজ)। স্যুয়েটোনিয়াস এবং ক্যাসিয়াস ডিয়োর মতো ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার জন্য নিরোকে অভিযুক্ত করে বলেন ঐ সময় তিনি মঞ্চ অভিনেতার পোষাকে Sack of Ilium সঙ্গীত গেয়েছিলেন। এটি গ্রিক ভাষায় হারিয়ে যাওয়া এক মহাকাব্য যা পদ্যে গাওয়া হত। ঐ অগ্নিকান্ডের প্রাচীনতম ও প্রধান ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে টাসিয়াসকে ভাবা হয়। টাসিয়াসের মতে নিরো তখন অকুস্থলে ছিলেনই না, ছিলেন অ্যান্টিয়ামে। আগুনের সংবাদ পেয়ে তিনি রোমে ফিরে এসে ত্রাণকার্যে লেগে যান। নিজের প্রাসাদ খুলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দেন। পরবর্তীকালে তিনি নতুন প্রসাদ গড়েন। টাসিয়াস বলেছেন নিরো বিশ্বাস করতেন এটা খ্রিস্টানদের কাজ। খ্রিস্টানদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতা ছিল মাত্রাছাড়া। হিংস্র পশুর মুখে ফেলে, ক্রুশে ঝুলিয়ে এমনকী জীবন্ত দগ্ধ করে নিরো তাদের হত্যা করতেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ যাই হোক, জনতার রোষকে প্রতিহত করতে না পেরে নিরো আত্মহত্যা করেন।

নিরোর পর রোমে ভেসপেসিয়ান, টাইটাস, ট্রাজান হেড্রিয়ান প্রমুখ শাসক ক্ষমতায় আসেন। অবশেষে কনস্ট্যানটিনের শাসনকালে (৩২৪-৩৩৭) রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা পায়। সেই সঙ্গে বিশাল সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হলে বাইজান্টিয়ামে গড়ে ওঠে দ্বিতীয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। অবশেষে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পতন হয় রোমের।

খ্রীঃপূঃ ৭৫৩ তে একটি গ্রামে যে রোমের পত্তন হয়েছিল ৭২৩ বছর পর তার বর্ণময় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটলেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য রমরমিয়ে চলেছিল বহু দিন। অবশেষে তাকে ১৪৯৩ তে অটোমান তুর্কের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

প্রজাতান্ত্রিক রোমের প্রতীক ফোরাম থেকে কয়েক পা গেলেই রোমানদের আদিম বিনোদন ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক কলোসিয়াম। ভিয়া ইম্পিরিয়ালি সোজা পূর্ব দিকে এসে এখানেই শেষ হয়েছে। স্কুল জীবন থেকে ছবিতে এই ইমারতের সঙ্গে পরিচিত। তবুও চিনের প্রাচীর, পারীর আইফেল বা আগ্রার তাজের মত অভিভূত না হয়ে থাকা যায় না।

রোমান স্থপতিদের অসাধারণ কীর্তি এই কলোসিয়ামের বাইরের গঠন অভূতপূর্ব। চারতলা এ্যাম্ফি থিয়েটারটির তিনতলা থাম ও আর্চের সমন্বয়ে তৈরি। একতলার থামগুলি ডোরিক, দোতলায় আয়োনিক আর তিনতলায় করিন্থিয়ম থাম। চতুর্থ তলায় আর্চ নেই, শুধুই থাম আর ইঁটের গাঁথনি। যে কলোসিয়ামের বাহিরাঙ্গের এত আকর্ষণীয় রূপ তার ভিতরে যে কী ভয়ংকর দৃশ্য চলতো তা কল্পনা করা কঠিন।

নিষ্ঠুর সম্রাট নিরো তাঁর স্বর্ণ প্রাসাদ নির্মাণকালে সন্নিহিত অংশে যে বিশাল কৃত্রিম জলাশয় বানিয়েছিলেন ভেসপেসিয়ান সেই জলাশয় বুজিয়ে ৭০ খ্রিস্টাব্দে এই ফ্লেভিয়ান অ্যাম্ফি থিয়েটারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এটা অনেকটা লাসা দখলের পর গ্রেট পোতালা প্রাসাদের দক্ষিণে অবস্থিত বিশাল জলাশয় বুজিয়ে মাও জে দঙের লাসা স্কোয়্যার বানানোর মত।

ভেসপেসিয়ান ছিলেন বুদ্ধিমান সম্রাট। অত্যাচারী নিরো জামানার পর দশলক্ষ ছাড়িয়ে যাওয়া রোমের জনগণের মধ্যে জীবন জীবিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ। পরজীবী অর্থনীতিতে কাজের খুবই অভাব। সম্রাট জনগণকে তুষ্ট করতে খেলা, মেলা, সার্কাস প্রভৃতি আয়োজন করলেন। সেই সঙ্গে হাত দিলেন এই বিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটার নির্মাণকার্যে। ভেসপেসিয়ান অবশ্য এই কাজ শেষ করতে পারেননি। তাঁর পুত্র টাইটাসের শাসনকালে ৮০ খ্রিস্টাব্দে এটির উদ্বোধন হয়। অষ্টম শতক থেকে যা কলোসিয়াম নামে পরিচিত।

কলোসিয়াম যখন আমরা দেখতে এসেছি ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো। প্রখর রোদের তেজে দাঁড়ানো দায়। এর বিশালত্ব থেকেই কলোসাস শব্দের জন্ম। পাশেই একটা হিলকের মতো জায়গায় নামমাত্র গাছের ছাওয়ায় রোদ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে কলোসিয়াম সংলগ্ন পারিপার্শ্ব অবলোকন করছি। টিকিট কেটে ভিতরে ঢোকার ইচ্ছে করলো না। অনেকের মতো আমারও ধারণা ছিল কলোসিয়াম বৃত্তাকার ইডেন উদ্যান হবে। ট্যুরিষ্ট লিটারেচারে দেখলাম একদা কাঠের মেঝের ওপর গড়া এই আদিম বিনোদন কেন্দ্রের অ্যারেনা নানান স্তরের আসনে সমৃদ্ধ। তাই আর মনো জগতের ধারণাকে আহত করার ইচ্ছে হল না।

উপবৃত্তাকার এই এ্যাম্ফিথিয়েটারটি নির্মিত হয় ট্রেভারটিন নামের লাইমস্টোন ইঁট আর কংক্রিট দিয়ে। ইতালিয়রাই নাকি প্রথম কংক্রিটের ব্যবহার করে। এখানে ৭০০০০ দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের বইমেলার মতো প্রবেশ ছিল অবাধ। গ্যালারিতে বসার ব্যবস্থায় রোমের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ছিল পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত আসনে। সবার সামনে বসতো সেনেটররা। তারপর সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা। এভাবে সবার পিছনে ছিল সাধারণের অধিকার। চিড়িয়াখানা বা সার্কাসের ট্র্যাপ ডোরের মত কায়দায় পশুদের আনা হত। তাদের মধ্যে ছিল সিংহ, লেপার্ড, হাতি, হায়না, গণ্ডার, ভল্লুক, জলহস্তি এমনকী উটপাখি পর্যন্ত। ইতিহাস জানাচ্ছে যখন একজন তিন সভ্যর পরিবারের রোমে গড়ে দৈনিক খরচ ছিল ছয় সেস্টারটি (মুদ্রা একক) তখন এই পশু বিনোদনের মাধ্যমে নরহত্যার খরচ ছিল গড়ে দেড় লক্ষ। অনুষ্ঠান হতো তিনটি পর্যায়ে। সকালে নানা সুর যন্ত্রানুষঙ্গে দু'জন রেফারি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে গ্ল্যাডিয়েটররা ঢুকতো। এদের অনেকেই থাকতো মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত। শুরু হতো পশুদের সাথে লড়াই। অপরাধীরা ভূগর্ভে বেশ কিছুদিন থেকে প্রস্তুতি নিত। তারপর মুক্ত বাতাসের অ্যারেনায় আসত।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় প্রাণদন্ডে দণ্ডিতদের শাস্তি কার্যকর হতো। তারা পশুযুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকারি ছিল না। অপরাহ্নে হতো গ্ল্যাডিয়েটরদের সম্মুখ সমর। সেখানে নানাস্তরে হিটে অংশ নিয়ে

চূড়ান্ত স্তরে উঠতে হত। কখনো কখনো রোমানদের সাথে গলেদের যুদ্ধের অনুকরণ ছিল এই বিনোদনের মাধ্যম।

মনে মনে ভাবি, বান্দোয়ানের জঙ্গলে পায়ে ছুরি বেঁধে মোরগ লড়াইকে স্যাভেজ ইনস্‌টিক্ট বললে কলোসিয়ামের বিনোদনকে কী বলবো? মানুষ বোধ হয় আজও এক পাও এগোয়নি নইলে এ যুগে আউসভিস্ট, হিরোসিমা, পলপট, তিয়েন আন মেন ঘটবে কেন? মানুষের সভ্য হওয়াটা সত্যিই বহু শতাব্দীর রেনেসাঁ মনীষীর কাজ।

পথে গ্ল্যাডিয়েটরের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু লোক। পয়সার বিনিময়ে হাতে টিনের তলোয়ার, মেদুসার ছবিসহ ঢাল আর মাথায় সেকুটর মুখোশ পড়ে ছবি তোলার জন্য দাঁড়াবে। কেউবা কেবলই দীর্ঘ দেহী ভঙ্গিতে নীরবে বসে। সামনে রাখা কৌটো।

ইম্পিরিয়াল রোম ছেড়ে মনুমেন্টাল রোমের পথে অগ্রসর হই। লক্ষ্য ট্রেভি ফাউন্টেন। যৌবনে কপোত-কপোতি স্প্যানিশ স্টেপে আড্ডা দেবে না কিংবা ট্রেভিফাউন্টেনে কয়েন ফেলবে না ইউরোপে তা অনেকের কাছে অচিন্তনীয়। শহরের প্রধান গোয়েন্দা দপ্তরের গায়ে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছে গেলাম ঝর্ণাতলিতে। ট্রেভি ফাউন্টেনের অবস্থান পিয়াৎসা ভেনেসিয়ার উত্তর-পূর্বে।

একেবারে কলকাতার ম্যাঙ্গো লেন – লায়ন্স রেঞ্জের মতো অঞ্চল। মাঝে মাঝে মনে হয় এদের যা কিছু কালজয়ী সৃষ্টি সবই শহরে। আমাদের ক্ষেত্রে খাজুরাহো, অজন্তা, সাঁচি বা শ্রবণবেলগোলারা সব ফার ফ্রম ম্যাডিং ক্রাউড। এমন এক ঘিঞ্জি অঞ্চলে ট্রেভি ফাউন্টেনকে পাবো রোমান হলিডে দেখে মনে হয়নি। এক প্রাসাদের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো নেপচুন, অসমতল ঢালে রয়েছে তার দুই রথ চালক। দুটি সমুদ্র – ঘোড়ার দৃপ্তভঙ্গি। পাহাড়ি প্রাসাদের গা বেয়ে জল জমছে এক ছোট জলাধারে। ধারে বেঞ্চ পাতা। ভ্রমণার্থীর ভিড়ে সুস্থভাবে দাঁড়ানো যায় না। এই শোলডার সিজনেই যদি এই হয়, পিক সিজনে না জানি কী হবে? দেওয়ালটিও নানা মূর্তি শোভিত। এই চিত্তাকর্ষক শিল্পটির রূপকার নিকোলো স্যালভি ও ব্রাচি। অনেকের সন্দেহ ফোয়ারাটির পরিকল্পনাকার বার্নিনি। যেই করুক, এটি দেখে মোহিত হতেই হয়। চারিদিকে এক উৎসবের মেজাজ। অনেকেই দেখছি জলের দিকে পিছন ফিরে পয়সা ফেলছে। তিনবার ফেললে নাকি আবার রোমে আসা হয়। সংস্কারটির জন্মদাতা/দাত্রী কে জানতে ইচ্ছে করে। ট্রেভি ফাউন্টেনে সন্ধ্যার পর এই পয়সা সংগ্রহে কোন টেন্ডার ডাকা হয় কিনা কে জানে।

ফাউন্টেনের উত্তরেই স্প্যানিশ স্টেপ। ভ্যাটিকানের স্প্যানিশ রাজদূতের বাসস্থান এখানে তাই এই নাম। সিঁড়ি উঠে, গিয়ে মিশেছে এক চার্চে। এখানকার ক্রুশ থেকে সদ্য নামানো ক্রাইস্টের প্রস্তর মূর্তিটি অসাধারণ। পাত্র পাত্রীদের শারীরিক ভাষা, অঙ্গের ভঙ্গি যেন জীবন্ত। এমন বিষয়কে নিয়ে গড়া মূর্তি এ পর্যন্ত যতো দেখেছি নিঃসন্দেহে বলতে পারি এটাই সেরা। চার্চ প্রাঙ্গণ থেকে স্প্যানিশ স্টেপের অপূর্ব দৃশ্য। শুনেছি এখানেই কোথাও নাকি কাফে 'গ্রেকো' অবস্থিত যেখানে একদা গ্যেটে, শপাঁ, রোসিনি থেকে কানোভা, হাগনারের মত প্রতিভারা নিয়মিত মিলিত হতো। আছে শেলি ও কিটসের সমাধিও। দুঃখের বিষয় এগুলো অদেখাই থেকে গেল।

পিয়াৎসা নভোনা। আয়তক্ষেত্রাকার এই মুক্তাঙ্গনটি অতীতে ডমিশিয়ানের স্টেডিয়াম ছিল। নাগরিকেরা জমা হতো নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখতে। তিনটি ফোয়ারা এই স্থানটিকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দেয়। তার মধ্যে মধ্যমণিটি রাজকীয় মর্যাদার দাবিদার। ফোয়ারা তিনটিই বারোক ভাস্কর্যের আদর্শে তৈরি। বারোক শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল গতি, ছন্দ ও অলংকরণের আধিক্য। রেনেসাঁ শিল্পে এসবের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকে। মাঝের ফোয়ারাটি বার্নিনির অসামান্য সৃষ্টি। এর নাম ফাউন্টেন অব রিভারস। এই ফোয়ারার

KALPATARU AGROFOREST ENTERPRISES (P) LTD.

(Leading Raw materials supplier to the Paper & Rayon Mills in India)

Head Office

22, Stephen House (II nd Floor)
56E, Hemanta Basu Sarani (Old 4E, B.B.D. Bagh)
Kolkata - 700001
Phone : 033-22430156 / 22485101 / 22311182
Fax : 033-22101238
E-mail : Kalptaru@cal.vsnl.net.in

Branch Office

"Panchvati",
2/517, Vijay Khand Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Uttar Pradesh
Phone : 3021536

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | AN ISO 9002 COMPANY HINDAL ALUMINIUM LIMITED | NALCO Aluminium Sheet Coil | ALOM Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA
Fax : +91-33-2215 0455, 4050 3400
E-mail : alloy@cal3.vsnl.net.in **Website : www.alloyindia.com**
info@alloyindia.com

চারটি মুখ চার মহাদেশের চারটি নদীকে মর্যাদা দিয়েছে। এগুলি ইউরোপের ডানিউব, আফ্রিকার নীল, এশিয়ার গঙ্গা আর দুই আমেরিকার রিও ডি লা প্লেটা। অন্য দুটি হল ফাউন্টেন অব নেপচুন আর ফাউন্টেন অব মুর।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ও সূর্যের অস্তাভা স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে নভোনা তার রূপের মাধুরি বিচ্ছুরিত করে। ওপেন এয়ার রেস্তোঁরার রঙীন জমায়েত, ইজেল নিয়ে শিল্পীর ব্যস্ততা, চেলো ভায়োলিনের সুর মাধুর্য, মাউথপিস নিয়ে রক শিল্পীর নাচ, ফোয়ারার জলের শব্দ, প্রেমিক-প্রেমিকার ঘনিষ্ঠতা সব মিলিয়ে এক স্বপ্নের পরিবেশ। একথা বলতেই হয় At Navona Sunset brings unexpected magic. এই পিয়াৎসা যেন পিয়াৎসা ডি ক্যাপ্রিয়োর বৃহত্তর সংস্করণ। নভোনা আর 'আমাদের' পিয়াৎসা ডি ক্যাপ্রিয়ো যেন এপাড়া ওপাড়া। 'আমাদের' শব্দটা আপনা থেকেই এসে যায়। রোমকে কি নিজের ভেবে নিয়েছি? ক্ষতি কী? সারভেনতেস তো বলেছে When thou art at Rome, do as thy do at Rome.

নভোনার উৎসবয়তা কানায় কানায় পান করে আমরা ঘরের পথে। পিয়াৎসা ডি ক্যাপ্রিয়ো থেকে যে সংকীর্ণ পাথর বিছোনো গলিপথগুলো বেরিয়েছে তারই একটিতে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে আমাদের বাসা। একটি ছেলে হাঁটু মুড়ে বসে স্পিরিট দিয়ে অদ্ভুত এক দক্ষতায় ছবি আঁকছে। পরনে গেঞ্জি, জিনস, মাথায় ক্যাপ, পায়ে স্পোর্টস স্যু। অতি দ্রুত মোটা কাগজে একের পর এক এঁকে চলেছে রোমের নানান দৃশ্য। কলোসিয়াম, পাহাড়ি নিসর্গে ঝরনা, চাঁদনি রাতে কোনো প্রাসাদ বা ব্যাসিলিকা। তাকে ঘিরে পর্যটকের জটলা। একটা ছবি শেষ হলে তারা করতালিতে অভিনন্দিত করছে শিল্পীকে। বিক্রিও হচ্ছে দশ বারো ইউরোতে এক একটা ছবি। শিল্প ছেড়ে শিল্পীকে জানার আগ্রহ বাড়ে। জানতে চাই তার উৎসভূমি। উত্তর পেলাম বাংলাদেশ। নাম শিখন আহমেদ। আবেগতাড়িত হয়ে জড়িয়ে ধরলাম। এখানেই আয়ত্ত করেছে এই শিল্পকে। নিজে থেকেই বলল, 'আপনাকে আমি একটা ছবি গিফ্‌ট করবো, কাল আসেন এই সময়।'

ফ্রেশ হয়ে রাত ন'টায় ইউসুফের দোকানে ডিনার সারতে যাই। সামনেই তার ফাস্টফুড কাম স্টেশনারি দোকান। ইউসুফ বাংলাদেশি। বছর আটেক রোমে আছে। কাজ চালানোর মত ইটালিয়ান জানে। সকালেই আলাপ হয়েছে। রমজান মাস চলছে বলে সন্ধ্যার পর এক বাংলাদেশি ক্যাটারার ওর মত বাঙালিদের দোকানে দোকানে ভাত, ডাল, সবজি, মাছ দিয়ে যায়। একথা শুনেই অর্ডার দিয়েছি। প্রায় পনেরো দিন পর পেটে ভাত পড়বে।

কাউন্টার ছেড়ে ইউসুফ দোকানের অভ্যন্তরে এসে গল্পে মাতে, তখন কাউন্টার সামলায় তার বন্ধুর ভাগনা বাবলু। বছর পনেরোর কিশোর, তিনবছর বয়স বাড়িয়ে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে চলে এসেছে। পড়াশোনাটা ছুতো। নিজেই বলে মেয়াদ শেষে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ দেখিয়ে আছে। বাবলুর স্বপ্ন এখান থেকে জাপানে যাবে। সেখানেও নাকি ওর জামাইবাবুর ব্যবসা আছে। ভিসা বানাতেই তার প্রথম কলকাতা দেখা। মনে মনে ভাবি সঙ্গী রাজীবকে এক মাসের ট্যুরিস্ট ভিসা পেতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি অথচ বাবলুরা কতো সহজেই ইতালীয় হয়ে যায়।

ইউসুফের দোকানে কাজী নজরুলের ছবি। নজরুলকে সে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। সেই সঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে বলে ২৫ ডিসেম্বরে এখানে নাকি গির্জায় লোকে যতো না যায় তার চেয়ে বেশি মাতে পিয়াৎসার ফুর্তিতে। প্রসঙ্গত জানালো কাল উৎসবের আবহ তৈরি হবে আমাদের এই পিয়াৎসায়, কারণ কাল শনিবার।

It is impossible to believe in God
like it's impossible not to believe in him.
Voltaire

আজ গোটা দিনটা দেবো ভ্যাটিকানকে, রাতটা কাটাবো পিয়াৎসার ফিয়েস্টায়, কারণ অদ্য শেষ রজনী। নিজেদেরই ভুলে অনেকটা দক্ষিণে গিয়ে নদীর পশ্চিম পাড় বরাবর রাস্তা ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকি। লাভের মধ্যে টাইবারকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়া গেল।

চিনারের মত প্রবীণ বৃক্ষের পরিকল্পিত সৌন্দর্যায়নের চিহ্ন পুরো রাস্তা জুড়ে। নদীকে ডান হাতে রেখে গাছের ছায়ায় অনেকটা পথ হেঁটে পন্টে উম্বেতো সেতু। এই নদীতীরবর্তী পথটুকু ছাড়া রোম নগরীতে তেমন সবুজ চোখে পড়লো না। ভার্গেস উদ্যানকে বাদ দিলে পাথরে মোড়া এ নগরীর আনাচে কানাচে একটাই গাছ, তার নাম স্টোন পাইন বা মাসরুম পাইন। লম্বা নিষ্পত্র কাণ্ডের মাথায় অনেক ওপরে ছাতার মত পাতার সমাবেশ।

কিছুটা গিয়ে সমীপবর্তী হই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ভ্যাটিকানের। সুউচ্চ পাঁচিলে ঘেরা ১০০ একরের দেশ ভ্যাটিকান। শাসক একজনই, তিনি হলেন সমগ্র ক্যাথলিক বিশ্বের পোপ। দেশের সর্বশেষ জনগণনায় দেশের জনসংখ্যা ৫৯৪ জন। যার মধ্যে যাজক ৩০৭ জন এবং সুইস গার্ডের সংখ্যা ১০৯। এদেশের জন্য রয়েছে পৃথক পতাকা, ডাকটিকিট, জাতীয় সঙ্গীত। মনের মধ্যে চিনচিনে টেনশন, না জানি কত লম্বা লাইন পড়বে। অবশেষে দাঁড়িয়ে গেলাম টেইল এন্ডে। কিছু সময় অন্তর বুকে ঝোলানো পরিচয় জ্ঞাপক কার্ড নিয়ে হাজির হচ্ছে বাংলাদেশের যুবকেরা। বাড়তি কিছু খরচ করলে স্থানীয় ট্যুর কোম্পানির মাধ্যমে সহযেই ভ্যাটিকানে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবে।

ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল পোপের দেশে প্রবেশ করতে। পাগান যুগে রোমান নেক্রোপলিসের ওপর গড়ে উঠেছে ষোড়শ শতকের গোড়ায় এই ভ্যাটিকান। এখানেই ছিল নিরোর বাগান। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে আরো অনেকের সঙ্গে সেন্ট পিটারকে উল্টোনো ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় এখানেই। পরবর্তীকালে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের হাতে পত্তন হয় ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের।

বিমানবন্দরের ব্যস্ত লাউঞ্জের মতো ভ্যাটিকান গ্যালারির মূল প্রবেশ দ্বারে প্রবেশ করা মাত্রই এক পরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় দর্শনার্থীকে যেতে হয়। তার অন্যথার কোন উপায় নেই। এখানে প্রবেশের আগে এই সংগ্রহশালার বিশালত্ব সম্পর্কে গড়ে ওঠা ধারণা প্রবলভাবে ধাক্কা

খেল। ল্যুভের, ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা উফিজি দেখা সত্ত্বেও বলতেই হয় ভ্যাটিকান ভ্যাটিকানই।

এখানে সর্বমোট ৫৪টি গ্যালারি আছে। যার অন্যতম হল সিসটিন চ্যাপেল। বছরে ৬০ লক্ষর বেশি দর্শক সমাগম হয়েছে এখানে ২০১৬ তে। এক ব্রোশিওরে বলা আছে এই সংগ্রহশালাটি পরিদর্শনের সেরা উপায় হলো সব দেখার চেষ্টা না করা। কারণ, প্রদর্শন পথের সর্বমোট দৈর্ঘ্য হল সাত কিলোমিটার। তাই প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া ভালো কী কী বিশেষ করে দেখতে চাই। বর্তমান আন্তর্জাল মাধ্যম এ বিষয়ে মস্ত বড়ো সহায়। সব কিছু দেখা এক মাসেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। আমরা তেমন ভাবেই প্রস্তুত হয়ে প্রবেশ করলাম।

প্রথম দিকের কক্ষগুলোতে প্রাচীন গ্রিস ও রোমের অমূল্য সব ভাস্কর্য প্রদর্শিত। বহু বিলুপ্ত গ্রিক ভাস্কর্যের রোমান প্রতিমূর্তির মধ্যে বেঁচে থেকেছে ইতিহাস। এমন একটি শিল্পকর্ম হল লাওকুন। উফিৎসিতেও এই শিল্পকর্ম দেখেছি। জানুয়ারি ১৪, ১৫০৬ সালে এটি রোমের এক দ্রাক্ষাকুঞ্জে মাটির তলায় পাওয়া গেলে গুলিয়ানো এবং মাইকেল এঞ্জেলোকে ডেকে তাদের কথামত পোপ সেই ভাইনইয়ার্ড কিনে নেন। এই শিল্পকর্মটি দিয়েই এই সংগ্রহশালার যাত্রাশুরু।

এখানকার অ্যাপোলো ডেল বেলভেডেরের গ্রিক ভাস্কর্যটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অ্যাপোলো একজন তিরন্দাজি দেবতা হিসেবে গ্রিস ও রোমে সমান ভাবেই পূজিত ছিল। এক নিখুঁত পুরুষ মূর্তির মর্যাদা পেয়েছে এটি শিল্পবেত্তাদের কাছ থেকে। সম্রাট নেপোলিয়নের অত্যন্ত প্রিয় ভাস্কর্য ছিল এটি।

এই মিউজিয়ামের অন্যতম প্রধান গর্বের হল মিশরীয় কক্ষটি। অসংখ্য প্রস্তর ভাস্কর্যর সাথে একের পর এক মমির সমাবেশ স্তম্ভিত করে দেয়।

গ্রিক ভাস্কর্যের হলটি অতীতে পোপের প্রধান অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হত। সেখান থেকে টেপস্ট্রি হলের অপার্থিব সৌন্দর্য ধরা দেয়। দর্শন পথে আপনা থেকেই এখানে দর্শনার্থীকে আসতে হবে। এখানকার থ্রি-ডাইমেনশনাল চিত্রগুলো মোহিত করে। রেজারেকশান অব ক্রাইষ্ট শিল্পকর্মটি পশম, সিল্ক, সোনা ও রুপোর সমন্বয়ে গড়া। এরকম অসংখ্য চিত্র বছরের পর বছর ধরে শিল্পীরা গড়েছে। দর্শক যতক্ষণ এই কক্ষে এগোবে মোনালিসার মত জেসাসও তার দিকেই তাকিয়ে থাকবে। ফ্লেমিশ টেপস্ট্রির এই অলঙ্করণের অনেকগুলোই রাফায়েলের ছাত্রদের সৃষ্টি। এক একটি চিত্রের ব্যাপ্তি ও সোনালি রঙের বিচ্ছুরণ যেন সোনার চাঁদোয়া বিছিয়ে রেখেছে সুদীর্ঘ হলটির অর্ধবৃত্তকার সিলিঙে।

ট্যাপস্ট্রি হল ছেড়ে প্রবিষ্ট হই ম্যাপস গ্যালারিতে। একই রকম অতিকায় এক একটি প্রাচীন মানচিত্র দেওয়াল জুড়ে আঁকা। বেশিরভাগই ইতালি ও রোম সাম্রাজ্যের। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইতালিয় সন্ন্যাসী ইগনাজিও দান্তির নিখুঁত ও নিপুণ সৃষ্টি এগুলি। স্পষ্ট দৃশ্যমান পর্বত শ্রেণী থেকে সমুদ্রের নৌকো পর্যন্ত।

একটি কক্ষে মুখোমুখি হই সেই গ্রিকো-রোমান হেলেনিস্টিক ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ফেডেলে'র সাথে। ইতালিয় ভাষায় 'ফেডেলিনো'। এখানে একটি বালক পা থেকে কাঁটা তুলছে। ফ্লোরেন্স এবং ল্যুভেরেও এটি দেখা যায়। রয়েছে রঁদ্যার দ্য থিংকার।

এক সময় এসে উপস্থিত হই অক্টাগোনাল কোর্টইয়ার্ডের খোলা আকাশে। চারদিকে নীরব ভাস্কর্যের সমাবেশ। দু'দণ্ড জিরোনোর এহেন শিল্প সমারোহ যেন পরিকল্পনা করেই বানানো। তা না হলে সিস্টিন চ্যাপেল পরিদর্শনের জন্য মন ও চোখ প্রস্তুত হবে না।

এর পরেই যে দ্রষ্টব্যটি অভিভূত করে সেটি হল সালা রোটান্ডার বিশাল বৃত্তাকার বেসিন। এটি নিরোর স্বর্ণ প্রাসাদে ছিল। চল্লিশ ফুট পরিধির এই পাত্রটি Porphyry Basin নামে খ্যাত। এটি Igneous Rock দিয়ে তৈরি। যা কিনা লাভা শীতল করে বানানো। এই পাথর যেমন শক্ত তেমনই কাটা কঠিন এবং অবিশ্বাস্য রকম ভারী। এহেন বস্তুটি সুদূর মিশর থেকে আনার ও বানানোর মেহনত আক্ষরিক ভাবেই হারকিউলিসের কর্ম। এটির অন্য আর এক রহস্য হলো এর রঙ, যাকে গ্রিক ভাষায় পার্পল বলা হয়।

এর পর কিছু আধুনিক পেইন্টিং দেখে সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগানো সিস্টিন চ্যাপেলের ঐশ্বর্যের খনি রাফায়েল রুমে। এখানে এসে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসকে মনে পড়ে। জুলিয়াস দ্বিতীয় (কার্যকাল ১৫০৩-১৫১৩) শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি সেন্ট পিটার্স গির্জার জন্য স্থপতি ব্রামান্তে (১৪৪৪-১৫১৪), সিস্টিন চ্যাপেল আঁকার জন্য মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) এবং ভ্যাটিকান লাইব্রেরির (স্ট্যাঞ্জা দেল্লা সেগ্নাচুরা) চারটি দেওয়াল অলঙ্কৃত করার জন্য রাফায়েলকে (১৪৮৩-১৫২০) দায়িত্ব দেন।

দেওয়াল চিত্রের বিষয় অনুসারে ঘরগুলির নামকরণ করা হয়েছে। অভিভূত, বিহ্বল, বিভ্রান্ত ট্যুরিস্টদের মধ্যে একজন হয়ে রাফায়েল রুমে ঢুকে কালচার শকে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হই। বিশাল বিশাল দেওয়াল জোড়া বিষয় ভিত্তিক শিল্পকর্মগুলো দেখে মনে পড়ল অজন্তা দর্শনের কথা। এই ভ্যাটিকানের চেয়ে ১২০০ বছর আগের অজন্তাও ইউরোপের আবিষ্কার। রাফায়েল, অ্যাঞ্জেলোরা অজন্তা-ইলোরা দেখলে বিশ্বের শিল্প সভ্যতা কী আকার নিতো কে জানে?

চিত্রগুলোর ভয়ংকর রকম জোরালো আবেদন বাস্তবকে ভুলিয়ে দেয়। প্রতিটি চিত্র দেখলেও নিরিক্ষণ করলাম দুটি চিত্র। একটি ট্রান্সফিগারেশন, অন্যটি স্কুল অব এথেন্স। বিশ্ববিখ্যাত ও বহু আলোচিত শিল্পকর্ম দুটি বাকরুদ্ধ করে দেয়। ট্রান্সফিগারেশান কাজটি মৃত্যুর আগে রাফায়েলের শেষ সৃষ্টি। ম্যাথুর বাণীকে ভিত্তি করে এটি বানানো। হাল্কা রঙে উপরের অংশে জেসাসকে স্বাগত জানাচ্ছে এলিজা ও মোজেস। নিচে গাঢ় রঙে পৃথিবীর মানুষজন। বামদিকে নয়জন শিষ্য, যাঁরা পাহাড়ে আরোহণ করেননি। নীল পোশাকের মানুষটি সম্ভবত ম্যাথু। চিত্রটির একঅংশ স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত অন্য অংশে পার্থিব দৃশ্য বর্ণিত। চিত্রশিল্পের ভাষায় বলা হয় এই চিত্রটি ১৫০০ শতাব্দীর হাই রেনেসাঁ ও ১৬০০ শতকের বারোক কীর্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। দু'পাশে রাফায়েলেরই আঁকা দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট শিল্পকর্মের মাঝে এই বিখ্যাত চিত্রটির উজ্জ্বল উপস্থিতিই নাকি অ্যাঞ্জেলোকে তাঁর লাস্ট জাজমেন্ট সৃষ্টিতে

অনুপ্রাণিত করে।

দ্য স্কুল অব এথেন্স ছবিটি সিগনেচুরার পূর্ব দেওয়াল জুড়ে আঁকা। দুশো ইঞ্চি বাই দুশো ইঞ্চি মাপের এই ফ্রেস্কো সৃষ্টির সময়কাল ১৫০৯-১৫১১ খ্রিস্টাব্দ। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তখন ব্যস্ত সিস্টিন চ্যাপেলে। কেবল পোপ নয়, যুগ যুগ ধরে এই মেধাবী ছবিটি শিল্প রসিকদের তারিফ পেয়ে এসেছে। ছবিতে অর্ধবৃত্তাকার কৌণিক আর্চের মাঝ বরাবর তর্করত অবস্থায় আগুয়ান গ্রিসের দুই মহান দার্শনীক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল। সকলেই জানেন তাদের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের। পিছনে মাথায় বাঁদিকে কোণাকুনি অবস্থানে অ্যাপোলো ও ডানদিকে এথেনা। প্লেটোর হাতে স্বরচিত Timaeus আর অ্যারিস্টটলের হাতে নিকোমাচিয়েন (Ethics)। ইতালিতে এই দুই দার্শনিকের দর্শন নিয়ে চর্চা নতুন করে প্রাণ পেয়েছিল। কোসিনো দ্য মেদিচি (১৩৮৯-১৪৬৪) ফ্লোরেন্সে মার্সিলিও ফিকিনোকে (১৪৩৩-১৪৯৯) প্লেটোনিক একাডেমির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অন্যদিকে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিয়েত্রো পম্পোনাজি (১৪৬২-১৫২৫) এরিস্টটল চর্চাকে আকর্ষণীয় উচ্চতায় নিয়ে যান। সুতরাং সঙ্গত কারণেই রাফায়েল এই দু'জনকে এই চিত্রে মধ্যমণি করেছেন।

প্লেটোর ডানদিকে অর্থাৎ ছবির বাঁদিকে সক্রেটিশ একদল লোককে কিছু বোঝাছে। তার নিচের জায়গায় মাটিতে বসে বই খুলে মগ্ন পিথাগোরাস। যে মানুষটি দাঁড়িয়ে হাতে কাগজ নিয়ে পিথাগোরাসকে দেখছেন তিনি হচ্ছেন দার্শনীক এপিকিউরাস, যাঁকে আনন্দের প্রথম তাত্ত্বিক ভাষ্যকার বলা হয়। ছবিটির ডানদিকে স্লেটে জ্যামিতির ছবি এঁকে বোঝাচ্ছেন ইউক্লিড। তাঁরই পিছনে হাতে গ্লোব নিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে টলেমি। ছবিটির মাঝখানে সিঁড়ির উপর পা ছড়িয়ে বসে রয়েছেন সিনিসিজিমের উদ্ভাবক দার্শনিক ডায়োজেনেস।

এতজন জ্ঞানীর ছবি ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে একটা দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরি হয়নি। কারণ চরিত্রগুলি হাঁটে, আলোচনা করে, উত্তেজিত হয়, গা এলিয়ে দেয়, উঁকি মারে, লেখে। তাদের পোশাকের বৈচিত্র্য, রঙ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি সব আলাদা। সর্বোপরি এই ৪৩ জন একটি শতকের নন। এঁরা নানা ঘরানারও। কেউ সফিস্ট, কেউ স্টোয়িক, কেউ স্কেপটিক, কেউ সিনিক, কেউ বা এথিস্ট।

এর আগে কোনও একটা ছবির জন্য এতটা সময় দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। রেনেসাঁর প্রখ্যাত হিউম্যানিস্ট ভাষ্যকার ফ্রাঞ্চেস্কো ফাইলেলহো (১৩৯৮-১৪৮১) যথার্থই বলেছিলেন, গ্রিসের মৃত্যু হয়নি। তার আত্মা রেনেসাঁসের ইতালিতে নতুন করে জেগে উঠেছে।

সিস্টিন চ্যাপেলের অন্য যে কক্ষটি সর্বাধিক দর্শক আকর্ষণ করে যাকে বাদ দিয়ে এই সংগ্রহশালা অর্থহীন সেটি হল মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কক্ষ। জনসমাগম ল্যুভেরের মোনালিসার কক্ষটির সঙ্গে তুলনীয়। অন্য আর একটি বিষয়ে মিল হল এখানেই একমাত্র ক্যামেরা নিষিদ্ধ। দীপ্ত শিল্পকলা অন্তরের দেহলিতে যত খুশি ধরে রাখো। প্রহরী সতর্ক। তারই মধ্যে চেষ্টার শেষ নেই। সমগ্র সিলিং জোড়া বাইবেলের কাহিনি বর্ণিত। তার মধ্যমণি ক্রিয়েশন অব আদম। গুণমানে জনপ্রিয়তায় এই পৃথিবীতে যার জুড়িমেলা ভার। সুঠাম যুবা আদমের প্রসারিত হাত ঈশ্বরের প্রসারিত হাতের স্পর্শাকাঙ্খায় কাতর। ঈশ্বর এখানে একা নন। তাঁর আগলে রাখা কন্যাই কি ইভ? প্রতিটি দর্শক উর্ধ্বমুখ। এই সৃষ্টি অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যথার্থই তা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। প্রায় ২১ মিটার উঁচুতে আঁকা এই চিত্রের প্রতিটি অংশ সহজেই দৃশ্যমান। কী অসামান্য বৈজ্ঞানিক মনীষা এই সৃষ্টিশীলতায় কাজ করেছে। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। চিত্র বিশেষজ্ঞরা ঈশ্বরের মুখাবয়বে পোপের ছায়া খুঁজে পায়। একই ব্যক্তি যিনি ফ্লোরেন্সে ডেভিডের কারিগর এখানে তিনিই আদমের রূপকার। এক জায়গায় তার হাতে বাটালি হাতুড়ির আঘাত অন্যত্র তুলির পেলব স্পর্শ। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। শ্রদ্ধায় স্মরণে আসে আমাদের রামকিঙ্কর বেজ ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে। এরাও ছিলেন বাটালি ও তুলিতে সব্যসাচী।

এই বিশাল শিল্পকর্মটি শেষ করতে অ্যাঞ্জেলোর চার বছর সময় লেগেছিল। এতদিন ধরে মাচানে শুয়ে যে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় তিনি তাঁর শিল্পসত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তাকে সুপার হিউম্যান ছাড়া ভাবা যায় না। ঠাট্টা করে তিনি নাকি বলেছিলেন, চার বছর ধরে তাঁর সঙ্গী-সাথী ছিল শুধু দেওয়ালের ব্যস্ত মাকড়সারা। মাঝে মাঝেই পোপ গিয়ে অধৈর্য হয়ে জানতে চাইতেন কবে শেষ হবে? শেষের দিকে পোপের আচরণে ক্ষুব্ধ অ্যাঞ্জেলো ঘরে ফিরে ফ্লোরেন্স যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। তখন ক্ষমাপ্রার্থী পোপ দূতের মাধ্যমে কিছু অর্থ পাঠিয়ে দেন। অ্যাঞ্জেলো পোপকে ক্ষমা করেন, অর্থও গ্রহণ করেন, কিন্তু ফ্লোরেন্সের পথেও পাড়ি দেন।

চ্যাপেলের পিছনের দেওয়ালে রয়েছে এই বিরল প্রতিভার আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি লাস্ট জাজমেন্ট। এই চ্যাপেলের অন্য দেওয়ালগুলিও অন্যান্য কালজয়ী শিল্পীদের আঁকা ফ্রেসকো শোভিত। সেখানে বত্তিচেল্লি, সিনোরেল্লি, এঞ্জেলোর প্রথম শিক্ষক গিরলানডাইয়ো, র‍্যাফেলের শিক্ষক পেরুগিনো কে নেই?

ভ্যাটিকান মিউজিয়াম আর সিস্টিন চ্যাপেল দর্শনান্তে বাইরে এসে চমকের শেষ পদটি যেন অপেক্ষা করছিল। সেটা বিখ্যাত ভ্যাটিকানের সিঁড়ি। বৃত্তকার পথে এক শঙ্কুর আকৃতিতে নেমে গেছে। চোখ জুড়োনো পরিকল্পনায় নান্দনিক ছোঁয়া স্পষ্ট।

এসে দাঁড়াই সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকার বিখ্যাত চত্বর পিয়াৎসা স্যান পিয়েত্রোতে। পাথুরে চত্বরটি ঘিরে রয়েছে থামের সারি। মাথার উপরে খর তপনের অগ্নিবানে বিদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হল ব্যাসিলিকায় ঢোকার লাইনে। এগারো বছর ধরে অসাধারণ পরিশ্রমে এটি গড়ে তোলেন বার্নিনি। কলামগুলির মাথায় একশো চল্লিশ জন সেন্টের মূর্তি। কলোনেড ঘেরা চত্বরে ইস্টারে, খ্রিস্টমাসে লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। চত্বরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে এক বিশাল ইজিপসিয়ান ওবেলিস্ক। রোমান সাম্রাজ্যে সর্বত্রই গ্রিস ও মিশরের দান চোখে পড়ার মতো। ক্যালিগুলা ৪০ খ্রিস্টাব্দে এটি আনেন। ১৫৮৬ তে এখানে লাল গ্রানাইটের এই বস্তুটিকে আনতে আটশো শ্রমিক ও একশো পঞ্চাশটি ঘোড়া লেগেছিল। থামগুলো যেখানে শেষ হয়েছে

সেখানেই জগদ্বিখ্যাত ব্যাসিলিকাটি দাঁড়িয়ে।

কষ্টকর সোয়াঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে যখন এই অনুপম শিল্পমন্দিরটিতে ঢুকলাম তখন এটি বন্ধ হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। লাইনে দণ্ডায়মান অনেকেই ঢুকতে পারেনি। ইতালির পাঁচ শ্রেষ্ঠ রেনেসাঁস শিল্পী ব্রামান্টে, র‍্যাফেল, পেরুৎসি, স্যাঙ্গালো ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এটি নির্মাণে নিযুক্ত হন ও কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রয়াত হন। অবশেষে শেষ হয় ১৬৬২ তে।

ব্যাসিলিকাটির সম্মুখে প্যানথিয়নের অনুকরণে রয়েছে আটটি থাম। ঢুকেই এক করিডোর। হলটির জাঁকজমকপূর্ণ রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্য, মাইকেল এঞ্জেলোর অন্যতম সেরা 'পিয়েটা' দেখা হল না। পিয়েটার অর্থ মৃত পুত্রের দেহ কোলে মা মেরীর শোকপ্রকাশ। এখানে দেখা হল কর্নাচিনির তৈরি শার্লম্যান ও বেশ কিছু মূর্তি। সেন্ট পিটারের শায়িত প্রতিরূপ। সমাধির উপর ব্রোঞ্জের চাঁদোয়া। লাল কাঠের অপূর্ব কারুকার্যময় স্তম্ভ।

সারাদিন ধরে মিউজিয়াম ও সিসটিন চ্যাপেল দর্শনের পর আমাদের শিল্প সৌকর্য গ্রহণ করার ক্ষমতাও তলানিতে পৌঁচেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শারীরিক ক্লান্তিতে এ এক নতুন স্তাঁধাল এফেক্টে তখন দু'জনেই আক্রান্ত। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিকে আমি 'ভ্যাটিকান এফেক্ট' আখ্যা দিতে চাই। এখন আর কিছু না, চাই কোনো স্ট্রিট সাইড কাফেতে রিফ্রেশ হওয়া।

ভ্যাটিকান ছেড়ে আবার রোমে চলে আসি। ভিয়া কাভুর-এ এক জুতসই পথিপার্শ্বস্থ কাফেতে বসে ট্রাপিজিনো আর কাপুচিনো নিয়ে পরম তৃপ্তিতে দেখতে থাকি রোমের স্যাটারডে ইভনিং ফিভার। ভ্যাটিকান দর্শন করলে পোপেদের ভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহ জাগতে বাধ্য। সমগ্র ইতালির ইতিহাসে পোপতন্ত্রের পুনরুত্থান ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যেটা ১৪০০ থেকে ১৪৮৪ তে ঘটেছে। পঞ্চদশ শতকের শুরুতে রোম ছিল দীর্ঘ অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে। একদা বিস্ময় উদ্রেগকারী হর্ম্য, প্রাসাদ, সরকারি দপ্তর সব কিছুই ছিল ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গলাকীর্ণ। আজকের রোমের যে কোন রাজপথে দাঁড়িয়ে তাকে কষ্ট কল্পনা বলে মনে হয়। যথার্থই রোম এক হিস্টোরিক্যাল পাওয়ার হাউস।

১৪২০ তে পোপ পঞ্চম মার্টিনের হাত ধরে পাপাল যুগ যখন নতুন করে ফিরে এল তখন উত্তর ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় রোম অনেক অনুন্নত। ১৪৪৭-এ টাসকানির পুরোহিত পোপ পঞ্চম নিকোলাস এর কর্মযজ্ঞে প্রভূত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন কোসিনো দ্য মেদিচি। নিকোলাসই প্রথম ভ্যাটিকান গ্রন্থাগার গঠন ও উচ্চমানের পঠন পাঠন শুরু করেন। ১৪৫৩ তে কনস্টানটিনোপলের পতনের পর গ্রিক পণ্ডিতদের হাতে রক্ষা পাওয়া ও মালিকানাহীন প্রচুর বই নিকোলাস কিনে নেন। মাত্র আট বছরে এই পোপ প্রায় অসাধ্য সাধন করেন।

আবার পোপ চতুর্থ নিকসাসের সময় (১৪৭১) স্বজনপোষণ নতুন মাত্রা পায়। ভাইপো ভাগ্নারা এমনকি অবৈধ সন্তানেরাও পোপ হতে থাকে। এই চতুর্থ সিক্সাসের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য বৈপরিত্যও লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি মেদিচি পরিবারের এক সভ্যকে হত্যা করার চক্রান্তে যুক্ত হন, আবার তিনিই রোমের রাস্তাঘাট প্রশস্ত, আধুনিক, এমনকি বিশ্ববিখ্যাত ক্রিস্টিন চ্যাপেল নির্মাণের সূচনা করেন।

ঘরে ফেরার পথে দেখা গেল আমাদের পাড়ার পিয়াজা উইক এণ্ড কার্নিভালের আয়োজন চলছে। শিখন আমেদ তার দু'দুটো ছবি আমার জন্য রেখে দিয়েছে। টাকা কিছুতেই নেবে না। অনেক কষ্টে রাজি করানো গেল। দেখা হল এক সিরিয়ান যুবকের সঙ্গে। সকালেই তার দোকান থেকে দু'জোড়া দুল কিনেছি। অংশগ্রহণকারী থেকে পর্যটক উভয়েরই সংখ্যা আজ অনেক বেশি। সমগ্র ইউরোপ জুড়েই দেখলাম তারবাদ্য হিসেবে ভায়োলিন অসম্ভব জনপ্রিয়। কোনও কোনও শিল্পী নিজেদের সিডিও বিক্রি করছে। ফোয়ারার পাশে সুন্দর বসার আয়োজন। একেবারে পাশেই দুই কিশোর কিশোরী বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন। আমরা ব্যস্ত বিশ্রামে। বড়ো জানতে ইচ্ছে করে এদের কি পরীক্ষায় A++ কিংবা অনার্স পাওয়ার চাপ আছে? এদের ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বা টেট পরীক্ষায় কি তৈলাক্ত বাঁশে বানরের ওঠানামা নিয়ে ভাবতে হয়, নাকি সহজেই অন্তত কোনও পাবে বিয়ারের মগ ভরার কাজ বাঁধা। পরক্ষণেই ভাবি এসব গবেষণা করে ভ্রমণের মানে হয় না। এ যেন ক্যাম্প ফায়ারের পরিবেশ। ইউসুফ ভাই বাবলুর হাত দিয়ে এক কার্টন ক্যান বিয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে। নবজাগরণের ভূখণ্ড দর্শন আজ আমাদের সমে এসে থেমেছে। স্বভাবতই দুজনের মধ্যে এক সাফল্যের আনন্দ। ইচ্ছে করছে গলা ছেড়ে শুরু করি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর 'ক্ষতি কী না হয় আজ...' কিংবা কিশোরকুমারের 'হাল ক্যায়সা হ্যায় জনাবকা।' বলা যায় না শ'খানেক ইউরো মিলে যেতেও পারে। চরিত্রের সঙ্গে না মিললে রবিঠাকুরের শরণাপন্ন হব। উনিতো বলেছেন তাঁর স্বভাবের দোষ এবং গুণ দুটোই ছিল সামঞ্জস্যহীনতা। তেমন বেচাল হলে অ্যাম্বুলেন্সতো আছেই। প্রতি উইক এন্ডেই স্থানীয় প্রশাসন সতর্কতা অবলম্বন করে অ্যাম্বুলেন্স তৈরি রাখে। তবুও ইমোশানকে রিজনের বল্গায় বাধঁতেই হয়। রাত কাটলেই বিমান ধরতে হবে।

একপক্ষকাল ধরে এই ইউরোপ আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা জীবনে অমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে। সাত বছর আগে ঢাকা চট্টগ্রাম দিয়ে যে যাত্রা শুরু, চীনের রেশম সড়কের এক বড়ো অংশে বিচরণ করার পর মার্কোপোলোর ভেনিস ছুঁয়ে রোমে এসে আজ তার সমাপ্তি। বিমানে যখন ইস্তাম্বুল, দামাস্কাস, বাগদাদ, তাব্রিজ বা পেশোয়ারের ওপর দিয়ে দিল্লি ফিরবো তখন বারবার মনে হবে এই সফরের মত স্বচ্ছন্দে, নিরাপদে যদি ওই শহরগুলোকেও দেখার সুযোগ পেতাম কি ভালোই না হতো।

ইউরোপের যে ভূখন্ডকে এই ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তার নিসর্গ, ইতিহাস, শিল্প, সংগীত, মানুষ সব কিছুই আকর্ষণীয়। অনেক কিছুই দেখা হলো না, বিশেষ করে মিউনিখের ইংলিশ গার্ডেন এবং ইতালির পম্পেই। ইতালিকে জানতে হলে সময় নিয়ে ঘুরতে হয়, নয়তো ফিরে আসতে হয় বারে বারে। কিন্তু আমার কি দ্বিতীয় বার রোম দেখা হবে। আমিতো ট্রেভি ফাউন্টেনে কয়েন ফেলিনি।

প্রথম বিদুর

সন্দীপ চক্রবর্তী

দরজার পাল্লাদুটো যে বেজায় ভারী সেটা দূর থেকেই বোঝা যায়। ফ্রেমের ইঞ্চিছয়েক ওপরে লেখা 'শ্রীশ্রী কালিকাদেব্যৈঃ নমঃ'। ডানদিকের পাল্লার ওপর অপেক্ষাকৃত শহুরে চেহারার নেমপ্লেট। তাতে বাড়ির নাম লেখা— নারায়ণকুটীর। গ্রাম ও পোস্ট : গঙ্গাধরপুর, জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

খোকনদা বলল, 'চৌকাঠটা একটু উঁচু। সাবধানে আসিস।'

ভেতরে বিশাল উঠোন। একধারে চারটে ধানের গোলা। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রতিটি গোলায় ওই একই কথা লেখা— শ্রীশ্রী কালিকাদেব্যৈঃ

নমঃ। কৌতূহল হলো। বললাম, 'সব জায়গায় কালী ঠাকুরের নাম কেন খোকনদা?'

'আমরা তো মায়ের সেবায়েত। তাই সর্বত্র মায়ের নাম।'

বিদুর নেমপ্লেটটা মন দিয়ে দেখছিল। খোকনদার দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের একটা কালীমন্দির ছিল না?'

'ছিল কী রে! এখনও আছে। সব তোদের দেখাব। এখন ওপরে চল।'

উঠোনের তিনদিক জুড়ে দোতলা বাড়ি। একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত টানা বারান্দা। একেই বোধহয় চকমেলানো বাড়ি বলে। এরকম বাড়ি কলকাতায় এখনও দু-একটা আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি তাদের মধ্যে অন্যতম।

একটা বেশ চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। দোতলায় পা রাখা মাত্র ছড়া কাটার শব্দ পেলাম। খোকনদা গলা তুলে বলল, 'টুকাই, মাকে খবর দে। কলকাতা থেকে কাকুরা এসে গেছে।'

সাত-আট বছরের একটা বাচ্চা ছেলে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খোকনদা বলল, 'আমার ছেলে, টুকাই।'

বিদুর বাচ্চা ভালোবাসে। টুকাইয়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, 'তোমার ছড়াটা কিন্তু খুব সুন্দর। আমাদের একবার শোনাবে না?'

টুকাই কালবিলম্ব না করে ছড়া বলতে শুরু করল—

কালীঠাকুর কালীঠাকুর
নদী কোথায় বলো
কালীঠাকুর বলেন হেসে
পাতালদেশে চলো
চারটে ছাগল আসছে ছুটে
ঘাসের গন্ধ শুঁকে
নদীর বুকে ঘাস গজাল
ছাগল খাবে সুখে।

ছড়া শুনে বিদুর খুব খুশি। সমঝদার শ্রোতা পেয়ে টুকাইও উৎফুল্ল। পরে আরও অনেক ছড়া শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে গেল মাকে খবর দিতে।

আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। বললাম, 'এই ছড়া কার লেখা খোকনদা?'

'এ তো ছেলেভুলানো ছড়া। ছোটবেলায় আমিও বলতাম। গঙ্গাধরপুরের সব বাচ্চাই বলে। কার লেখা তা তো জানি না। কেন বল তো?'

'না, মানে টুকাইয়ের ছড়াতেও কালীঠাকুর আছেন তো, তাই!'

খোকনদা হো-হো করে হাসল। বিদুরও দেখলাম হাসছে।

যতই হাসিঠাট্টা করি মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিলাম। খোকনদা আমার আর বিদুরের কলেজের বন্ধু ধীমানের দাদা। ধীমানের অনুপস্থিতিই আমার অস্বস্তির কারণ। ওরও আসার কথা ছিল, কিন্তু অফিস থেকে ছুটি পেল না বলে আসতে পারল না।

অন্দরমহলে প্রবেশ করা গেল। খোকনদার স্ত্রী চৈতালী বৌদি দারুণ মিশুকে মহিলা। খোকনদার মুখে আমাদের পরিচয় পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে এমন আপন করে নিলেন যে আমার অস্বস্তি কেটে গেল।

অতঃপর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটা দক্ষিণ খোলা ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে গঙ্গাধরপুর রোড। রাস্তার ধারে ইটের তৈরি ব্যারিকেড। তার ওপারে অনেকটা খালি জমি পেরিয়ে একটা সরু খাল। খোকনদা বলছিল খালটার নাম গড়াই। একসময় গড়াই ছিল নদী। খালের দু'ধারের খালি জমি আসলে পুরনো নদীখাত। ভাগীরথীর শাখা নদী ছিল গড়াই। ভাগীরথী থেকে বেরিয়ে আবার ভাগীরথীতেই মিশে গেছে। মাত্র একশো বছর আগেও গড়াই ছিল ভরাট। ভাগীরথী সরে যাওয়ায় এখন তার এই হাল।

হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে সিগারেট ধরালাম। বিদুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকে বলল, 'ধীমান ফোন করেছিল।'

'আমি ভাবছিলাম ওকে একটা ফোন করব। যাক, কিছু বলল?'

'বলল মন্দিরটা যেন অবশ্যই দেখি। পুজো দেবার কথাও বলল। এখানকার মা কালী নাকি খুবই জাগ্রত।'

কথাটা অদ্ভুত লাগল। খোকনদা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু চাকরি না করে পৈতৃক জমিতে চাষাবাদ করে। পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা মন্দিরের প্রতি ওর টান থাকা স্বাভাবিক। ধীমান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এখন বেঙ্গালুরুতে পোস্টেড। ওর ছাত্রজীবনের সবটাই কেটেছে হস্টেলে। মন্দিরের প্রতি ওর এই টান কোথা থেকে আসে আমার বুদ্ধির অগম্য।

'এখানকার সবাই এমন মন্দির মন্দির করে কেন বল তো?'

'কারণ, মন্দিরটা সাধারণ নয়।'

'তুইও এই কথা বলছিস!'

'একটু তলিয়ে ভাবলে তুইও বলবি। মন্দির বা মন্দিরের দেবী সাধারণ হলে তাকে নিয়ে ছেলেভুলানো ছড়া লেখা হতো না।'

এই সময় একটি অল্পবয়সি মেয়ে চায়ের ট্রে হাতে ঘুরে ঢুকল। পিছনে বৌদি। শুধু চা নয়, সঙ্গে লুচি আর আলুর তরকারি। বিদুর কালক্ষেপ না করে খাওয়ায় মন দিল।

গঙ্গাধরপুরে কালীমন্দির ছাড়া আর কিছু দেখার নেই বৌদি— আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বৌদি অবাক হয়ে বললেন, 'ও মা! সেকি কথা! আড়াইশো বছরের প্রাচীন কালীপ্রতিমা দেখতে আশপাশের গ্রাম থেকে রোজ কত লোক আসে জানো? তাছাড়া আমাদের মায়ের কাছে যা

চাইবে, তাই পাবে।'

'না, মানে, শুনেছিলাম এখানে পর্তুগিজদের কীসব কেল্লা-ফেল্লা আছে—'

'দূর! সেসব তো কবেই ভেঙেচুরে গেছে। একটা লাইটহাউস ছিল, তাও সুনামির সময় নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে এখন সাপের আড্ডা। খবরদার ওখানে যেও না।'

বিদুর খেতে খেলে বলল, 'খোকনদার মুখে শুনলাম মন্দিরের সেবায়েত আপনারা। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাও কি এই বংশের কেউ করেছিলেন?'

আমার মনে হলো বৌদি কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'সেসব তোমরা দাদার কাছে শুনো। আমি ভালো বলতে পারি না।'

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম। কাজের মেয়েটি এঁটো থালাবাসন নিয়ে চলে গেল। বৌদিও আর দাঁড়ালেন না।

'তোর প্রশ্ন শুনে বৌদির বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে গেল কেন বল তো?'

'তুইও লক্ষ্য করেছিস?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এর কারণ কী?'

বিদুর আমার কথার জবাব না দিয়ে টুকাইয়ের ছড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে বলল, 'ছড়াটা কিন্তু দারুণ।'

বুঝলাম কিছু বলবে না। ভাবনার রসদ পেলে ও এরকম আবোলতাবোল কথা বলে আলোচনা থামিয়ে দেয়। কিন্তু কী ভাবছে যথক্ষণ না ও বলছে জানার কোনও উপায় নেই।

।। দুই ।।

পরের দিন খোকনদার সঙ্গে আমরা মন্দির দেখতে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। বিশেষ করে সাতদিন যখন থাকব, তখন পরে কোনও একসময় গেলেই চলত। কিন্তু বিদুর নিজেই কথাটা তুলল। খোকনদা সানন্দে রাজি। আমিও আর এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

নারানকুটীর থেকে হাঁটাপথে মন্দিরে যেতে মিনিট পনেরো লাগে। সাধারণ আটচালা ধরনের মন্দির। আড়াইশো বছরের প্রাচীনত্ব হয়তো আছে, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। নিয়মিত সংস্কারের ছাপ সর্বাঙ্গে। এমনকী কামাখ্যা মন্দিরের মতো লাল রংটাও সম্ভবত মাস ছয়েক আগে করা হয়েছে। বিশেষত্বের মধ্যে একটা জিনিসই চোখ পড়ল। সেটা মন্দিরের দরজা। আগাগোড়া লোহার তৈরি। খোকনদা বলল, 'এই অঞ্চলে নবাবি আমলে যেসব মন্দির তৈরি হয়েছে, তাদের সবার দরজাই নাকি লোহার। প্রতিমার অলংকারের সুরক্ষার জন্য সম্ভবত এই ব্যবস্থা।'

'এটা কার স্ট্যাচু, খোকনদা?'

বিদুরের গলা শুনে পিছন ফিরলাম। এতক্ষণ খেয়াল করিনি মন্দিরের মূল ফটক থেকে ফুটদশেক দূরে এক অচেনা প্রৌঢ়ের আবক্ষ মূর্তি।

'ইনি আমাদের পূর্বপুরুষ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এখানকার লোক ওঁকে নারানঠাকুর বলে ডাকত।'

খোকনদাদের বাড়ির নেমপ্লেটটার কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তার মানে এর নামেই নারানকুটির!'

'হ্যাঁ।'

বিদুর পলকহীন চোখে মূর্তিটা দেখতে দেখতে বলল, 'কিন্তু একটা তিনফুটের স্ট্যাচুর জন্য এত বড়ো বেদী কেন?'

ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। নারানঠাকুরের মূর্তির উচ্চতা তিন ফুটের বেশি হবে না। কিন্তু নীচের বেদীটি উচ্চতায় কমপক্ষে পাঁচ ফুট। চওড়াও ছ'ফুটের কম হবে না।

খোকনদা হেসে বলল, 'জানি না ভাই। যারা বানিয়েছিলেন তারা হয়তো জানতেন। আমি শুধু মাকে নিয়ে থাকি। আমার আর কিছু চাই না।'

মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। মূল ফটক থেকে একটা প্যাসেজ ক্রমশ চওড়া আর ঢালু হয়ে একটা চাতালে শেষ হয়েছে। চাতালের দু'দিকে দুটি প্রদীপ জ্বলছে। মাঝখানে ভয়ালদর্শন কালীমূর্তি। প্রদীপের ম্লান আলোয় হঠাৎ দেখলে বেশ গা ছমছম করে।

বিদুর নৃতত্ত্বের ছাত্র। দেবদেবীর মূর্তি সম্বন্ধেও তার বিস্তর পড়াশোনা। মোবাইলের টর্চের আলোয় ভালো করে প্রতিমা দেখে ও বলল, 'খোকনদা, এই মূর্তি নিশ্চয়ই ওই নারানঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেননি?'

'না, না। নারানঠাকুর এইটিন্থ সেঞ্চুরির শেষের দিকের লোক। মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার অনেক আগে। তবে হ্যাঁ, আমাদের পূর্বপুরুষেরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

বিদুরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'কিন্তু আমি যতদূর জানি, এই ধরনের মূর্তি বাংলার ডাকাতরা পুজো করত।'

'তুই ঠিক বলেছিস। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ডাকাতই ছিলেন। আশপাশের গ্রামের অনেকে এখনও গঙ্গাধরপুরের কালীমন্দিরকে ডাকাতে কালীর মন্দির বলে।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আমি এতটা অবাক হতাম না। খোকনদা খুবই সুপুরুষ। ধীমানকে তো রাজপুত্রের মতো দেখতে। মানুষ হিসেবেও দুইভাই চমৎকার। ওদের শরীরে ডাকাতের রক্ত বইছে, নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মন্দিরের বাইরে এসে খোকনদা বলল, 'এই মন্দির কিন্তু পরে হয়েছে। পরে মানে সতেরোশো নব্বইয়ের পর।

মূল মন্দিরটা গড়াইয়ের ধারে। জঙ্গলের ভেতর। নতুন মন্দির তৈরি হবার পর থেকেই ওটা পরিত্যক্ত। কেউ আর যায়-টায় না। তবে মন্দির পরিত্যক্ত হলেও মূর্তিটা কিন্তু হয়নি। ওটা অরিজিনাল।'

বিদুল বলল, 'সেটাই স্বাভাবিক। মূর্তিটা প্রোটো অস্ট্রলয়েড রীতির। ডাকাতদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যা বেশ মানানসই। কিন্তু মন্দিরটা রিজেকটেড হলো কেন?

'তার জন্য দায়ী একটা ঘটনা। তোরা কলকাতার ছেলে। তোদের সেসব শুনতে ভালো লাগবে না।'

রোমহর্ষক গল্পের সন্ধান পেয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তুমি বলো।'

'আমরা মানে গঙ্গাধরপুরের লোকেরা ঘটনাটা সত্যি বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু এর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। আমি শুনেছি বাবার মুখে। বাবা শুনেছিলেন দাদুর কাছে। গঙ্গাধরপুরের প্রতিটি মানুষ এইভাবেই এতদিন ঘটনাটার কথা জেনে এসেছে।'

দেখলাম বিদুরের চোখের মণিদুটো স্থির হয়ে গেছে। ওর একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। ও বলে, আমাদের দেশের সব জনশ্রুতি মিথ্যে নয়। ভালো করে বিশ্লেষণ করতে পারলে অনেক জনশ্রুতির মধ্যেই ঐতিহাসিক উপাদান মেলে।

কাছেই একটা গোড়াবাঁধানো বটগাছ। আমরা আরাম করে বসলাম। খোকনদা রিল্যাক্সড ভঙ্গিতে শুরু করল।

সময়টা পলাশির যুদ্ধের দু-এক বছর পর। গঙ্গাধরপুর সবদিক থেকেই তখন কুখ্যাত। একে তো চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। তার ওপর যে পনের-বিশ ঘর মানুষ বসবাস করে, তাদের বেশিরভাগই ডাকাত। গঙ্গাধরপুরের ডাকাতরা সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে যেত। আবার কখনও কখনও বিশেষ করে গরমের সময় সাঁড়ালের মাঠে অপেক্ষা করত। পালকি বা কোনও পথিক গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত। পুরো দলটাই ছিল লাঠিখেলায় ওস্তাদ। সেইসঙ্গে ফাঁস দিয়ে খুনও করতো। দূর থেকে ফাঁস ছুঁড়ে এমন কায়দায় টান দিত মুহূর্তের মধ্যে অসহায় পথচারী দম আটকে মারা যেত। নবাবি শাসন তখন শিথিল। কোম্পানির শাসনও ভালোভাবে চালু হয়নি। সুতরাং ধরা পড়ার সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। এসব তথ্য আমি পেয়েছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস থেকে। লেখক বৃন্দাবন দাস গঙ্গাধরপুরেরই লোক। পরে একদিন তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

আগেই বলেছি, আমার পূর্বপুরুষরা ডাকাতি করতেন। সবথেকে বড়ো কথা ডাকাত দলের সর্দার হতেন আমাদেরই বংশের কেউ। নিয়মটা করে দিয়েছিলেন পরেমশ্বর গুণিন। তিনি তখন এই অঞ্চলের নামকরা লোক। তন্ত্রসিদ্ধ জ্যোতির্মানব। যা বলেন তাই ফলে যায়। গণনা করে তিনি রায় দিয়েছিলেন আমাদের বংশের কেউ মাথার ওপর থাকলে ডাকাত দলের কোনও ক্ষতি হবে না। বাঁকিপুরে গুণিনের ভিটে এখনও আছে। প্রত্যেকবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়।

পরমেশ্বর গুণিনের বেঁধে দেওয়া নিয়মেই সব চলছিল। তাতে বাদ সাধলেন কালী ডাকাতের ছেলে নারায়ণচন্দ্র। একটু আগে যার মূর্তি তোরা দেখলি। নারায়ণচন্দ্র জানিয়ে দিলেন তিনি ডাকাতি করবেন না। ছোটবেলা থেকেই তিনি মা কালীর ভক্ত। প্রায় সারাদিনই তিনি মন্দিরে বসে থাকতেন। মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন। অনেক চেষ্টা করেও ছেলেকে বাগে আনতে পারলেন না কালীডাকাত। অকালেই তার মৃত্যু হলো। নারায়ণচন্দ্র তখন বিবাহিত। ঈশানচন্দ্রের বাবা।

নারায়ণচন্দ্র সর্দার না হওয়ায় ডাকাত দল ভেঙে গেল। গঙ্গাধরপুর মূলত ডাকাতদের গ্রাম হলেও দু-এক ঘর কৃষক ছিল। তাদের মধ্যে একজন শ্রীমন্ত দাস। একটু আগে যে বৃন্দাবন দাসের কথা বললাম, উনি শ্রীমন্ত দাসের বর্তমান বংশধর। ... যাই হোক, শ্রীমন্ত ছিলেন সম্পন্ন চাষি। তারা বৈষ্ণব হলেও নারায়ণচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বলতে পারিস এই দুজনের চেষ্টায় ডাকাতরা লাঠি ফেলে লাঙল ধরল।'

আমি সাহিত্যের ছাত্র। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'বলো কী! এ তো রেভেলিউশন।'

খোকনদা হাসল, 'তা তো বটেই। শ্রীমন্ত দাস উদ্যোগ নিলেন। জঙ্গল কেটে জমি চাষের উপযোগী করে তোলা হলো। পরের দুই দশকে গঙ্গাধরপুর হয়ে উঠল চাষিদের গ্রাম। ওদিকে নারায়ণচন্দ্রের জীবনেও ততদিন পরিবর্তন এসেছে। কালীসাধক হিসেবে তার নাম আশপাশের বিশটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন আর তিনি নারায়ণচন্দ্র নন, নারানঠাকুর। লোকে তাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মানে। তাদের বিশ্বাস, তিনি ডাকলে স্বয়ং মা গঙ্গাধরপুরে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু নারানঠাকুর জানেন, তিনি ঈশ্বর নন। তার জীবনেও শোকতাপ আছে। যক্ষ্মারোগে একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। বাড়িতে লোক বলতে বিধবা পুত্রবধূ পার্বতী এবং পৌত্র কার্তিকচন্দ্র।

গঙ্গাধরপুরের জীবন তখন নিস্তরঙ্গ। কিন্তু হঠাৎই এক দারুণ দুর্বিপাক ঘনিয়ে উঠল। গঙ্গাধরপুর ছিল বানিয়ালের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। বানিয়ালের জমিদার তখন বিরাজনারায়ণ রায়চৌধুরী। লোকটা যেমন অত্যাচারী

তেমনই লম্পট। সুন্দরী মেয়ে বউদের রেহাই ছিল না। বিরাট লেঠেল বাহিনী ছিল বিরাজনারায়ণের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করত চারজন বাছাই করা লেঠেল। রতন, শিবু, হারান আর ভূষণ।'

ওদের নজর নিশ্চয়ই গঙ্গাধরপুরেও পড়েছিল— বিদুর অনেকক্ষণ পর কথা বলল।

'হ্যাঁ। গ্রামের কয়েকটা মেয়ে পরপর নিখোঁজ হয়ে গেল। তাদের কারোর কারোর লাশ ভেসে উঠল খড়াইয়ের জলে। গঙ্গাধরপুরের সকলেই তখন আতঙ্কিত। বিশেষ করে যাদের মেয়ে আছে, তারা। নারানঠাকুর আর শ্রীমন্ত দাস অনেক ভাবনাচিন্তা করেও কী করবেন বুঝতে পারেন না। এর মধ্যে একদিন পার্বতীর পালকি আক্রান্ত হলো।'

'পার্বতী মানে নারানঠাকুরের পুত্রবধূ?'— উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

খোকনদা ওপর-নীচে মাথা নেড়ে বলল, 'পার্বতী সম্ভবত কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। এখানকার জনশ্রুতি অনুযায়ী পালকির বেহারাদের সাহায্যে পার্বতী পালাতে পারলেও বিপদ কাটেনি। দু'দিন পর নারানঠাকুরের কাছে হাজির হয় চার মূর্তিমান। তাদের দাবি পার্বতীকে তুলে দিতে হবে, নয়তো জমিদারের লেঠেল এসে গঙ্গাধরপুর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। অনেক বুঝিয়েও তাদের নিরস্ত করা গেল না।'

'তারপর কী হলো?'

'এখানকার লোকে বলে ডাকাতে কালীর মন্দিরে নাকি গুপ্তধন ছিল। এবং রতন ছিল গঙ্গাধরপুরের পাশের গ্রাম চন্দনদাঁড়ির লোক। সে জানত, গুপ্তধনের কথা। সে-ই নাকি বলে গুপ্তধন যদি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তারা গঙ্গাধরপুরের কোনও মেয়ের অনিষ্ট করবে না।'

'নারানঠাকুর নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব মেনে নেননি।'

'প্রথমে নেননি। চার শয়তানের মুখের ওপর নাকি বলে দিয়েছিলেন গুপ্তধন কোথায় আছে তিনি জানেন না। কথাটা সম্ভবত সত্যি। কারণ, ছোটবেলা থেকে তিনি কালীভক্ত। মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত সম্পদ রক্ষা করতে চাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার এটাও সত্যি রতনের দাবি মেনে না নিলে গঙ্গাধরপুরের মেয়েদের সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা। সেইজন্যই বোধহয় পরে শ্রীমন্ত দাসের পরামর্শে তিনি এই অন্যায় শর্ত মেনে নেন। এবং গুপ্তধন খোঁজার সময় চেয়ে নিয়ে দুদিন পর ওদের আসতে বলেন।'

'দুদিন পর কেন?'— এবার বিদুর প্রশ্ন করল।

'কারণ, দুদিন পর ছিল অমাবস্যা। নারানঠাকুর নাকি মনস্থির করে ফেলেছিলেন। এতদিন কালীসাধনা করে তিনি যে শক্তি অর্জন করেছেন, তারই প্রয়োগ ঘটাবেন অমাবস্যার রাতে। তা না হলে তিনি গঙ্গাধরপুরের ঐতিহ্য, পরম্পরা, সম্পদ, নারী কিছুই বাঁচাতে পারবেন না। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে ওরা এল। নারানঠাকুর মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। তারপরেই ঘটল সেই যুগান্তকারী ঘটনা।'

'কালীঠাকুর এলেন?'— উত্তেজনা বশে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'বাবার কাছে শুনেছি, স্বমূর্তিতে আসেননি। সেদিন তিনি প্লাবন হয়ে মন্দিরে এসেছিলেন। প্রচণ্ড আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন চার লেঠেলকে। খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের। জলের প্রচণ্ড তোড়ে কোথায় ভেসে গিয়েছিল কে জানে! বিপুল শক্তি নিজের শরীরে ধারণ করার ফলে নারানঠাকুরও সম্ভবত মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তার মৃতদেহ দেখেনি। জলের গর্জন শুনে শ্রীমন্ত দাস গ্রামের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে শুধু দেখেছিলেন, খোলা চুলের একটি মেয়ে মায়ের মূর্তি হাতে নিয়ে গড়াইয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।'

'উনিই নিশ্চয়ই মা কালী?'— আমি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম।

খোকনদা হাতজড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ অমিত। উনিই। গঙ্গাধরপুরের সবাই তাই বিশ্বাস করে। পরেরদিন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল এখন যেখানে মন্দির, সেখানে। ইঙ্গিত স্পষ্ট। মা আর পুরনো মন্দিরে থাকবেন না। দুর্বৃত্তের পা পড়েছে, অপবিত্র হয়ে গেছে মন্দির। শ্রীমন্ত দাস নতুন মন্দির তৈরি করে দিলেন।'

'বিরাজনারায়ণ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেনি?'— বিদুর জিজ্ঞাসা করল।

'না। নারানঠাকুরের অলৌকিক কাহিনি আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মায়ের কৃপায় গ্রামের লোকেরাও তখন এককাট্টা। তাই বোধহয় বিরাজনারায়ণ সাহস পায়নি।'

'নারানঠাকুর কোথায় গেলেন এই প্রশ্নও কেউ করেনি?'

'কেন করবে! তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে, তারা জানে সিদ্ধিলাভ হবার পর সাধকের দেহ থাকে না। সেদিন নারানঠাকুর তাঁর অর্জিত শক্তি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাই করতে গিয়ে তার ব্রহ্মদর্শনও হয়েছিল। তারপর সাধক আর বাঁচে না।'

'কিন্তু মৃতদেহটা তো থাকবে?'

'মা স্বয়ং নিয়ে গেলে তাও থাকবে না।'

খোকনদার ব্যাখ্যায় বিদুর সন্তুষ্ট হলো না। উদাসীন ভঙ্গিতে সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'মন্দিরের ভেতর জল ঢোকার রাস্তা ছিল কিনা তুমি জানো?'

'সেটা আর একটা মজা। মন্দিরে দুটো দরজা আর একটা জানালা। সেদিন তিনটেই বন্ধ ছিল। অন্য কোনও রাস্তার

প্রশ্নই ওঠে না। অথচ মন্দিরের ভেতরটা পুরোটাই নাকি জলে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু বাইরে জলের চিহ্ন ছিল না। সবই মায়ের মাহাত্ম্য।'

খোকনদা আবার হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল।

বিদুর উঠে পড়ল। সে যে কোনও বিষয়ে চিন্তামগ্ন, তার ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট। এখন সে জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ভাবনায় ডুবে থাকবে। যারা ওকে ভালোভাবে জানে না তাদের কাছে ব্যাপারটা বিসদৃশ লাগতে পারে। তাই বললাম, 'চলো খোকনদা, এবার ফেরা যাক। বেলা অনেক হলো।

।। তিন ।।

পুরো একটা দিন বিদুর চুপচাপ বসে থেকে কাটিয়ে দিল। আমি সকালে আর একবার মন্দির দেখলাম। নারানঠাকুরের কাহিনি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত সেদিন তিনি না থাকলে গ্রামের মেয়েগুলোর সর্বনাশ হয়ে যেত। বিকেলে গেলাম খোকনদার ফার্মিং দেখতে। সে-ও অসাধারণ একটা ব্যাপার। বছর তেত্রিশের একজন যুবক কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে দেখলাম, বিদুর তখনও বারান্দায়। আরামচেয়ারে বসে সিগারেট খেয়ে চলেছে। কাছে যেতেই বলল, 'কয়েকটা গিঁট খুলছে নারে অমিত।'

'কীসের গিঁট?'

'খোকনদা যতই মায়ের কৃপার কথা বলুক, মন্দিরের ভেতরে জল ঢোকার একটা রাস্তা থাকতেই হবে। নয়তো ভেতরে জল বাইরে শুকনো— এই তত্ত্ব দাঁড়াবে না। দ্বিতীয়ত, পাঁচটা বডি কোথায় গেল? ভেসেও যদি যায় তা কোন পথে? তৃতীয়ত, ওই খোলাচুলের মেয়েটা! মন্দিরের ভেতর জল থাকলে সে ঢুকল কীভাবে?'

'আরে এইজন্যই তো খোকনদা বারবার মায়ের কৃপার কথা বলছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কী এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটানো সম্ভব?'

বিদুর চোখ পাকিয়ে বলল, 'দ্যাখ অমিত, আমি নাস্তিক নই। আবার অন্ধও নই। যে ঘটনায় তোরা শুধু দৈবী মাহাত্ম্য দেখছিস, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এর পিছনে একটা প্ল্যানিং রয়েছে।'

অবাক হলাম, 'প্ল্যানিং! কার প্ল্যানিং?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। পুরনো মন্দিরটা একবার দেখতেই হবে। আমার প্রশ্নের উত্তর কোথাও যদি থাকে তো ওখানেই থাকবে।'

কিছু বললাম না। বলে লাভও নেই। বিদুরের মনে একবার কোনও বিষয়ে খটকা লাগলে সমাধান না করা পর্যন্ত ও স্বস্তি পায় না। ছোটবেলা থেকে দেখছি।

কিন্তু একটা কথা না বললেই নয়, 'প্ল্যানিং যদি কিছু থেকেও থাকে, তোর কী মনে হয়, আড়াইশো বছর পর তুই তার কথা জানতে পারবি?'

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? সফল হলে ইতিহাসের একটা মিসিং লিঙ্ক তো খুঁজে পাওয়া যাবে।'

রাতে খাবার সময় বিদুর বলল, 'খোকনদা কাল আমি একবার পুরনো মন্দিরে যাব।'

খোকনদা অবাক, 'পুরনো মন্দিরে! তা হয় না বিদুর। সেই ঘটনার পর কেউ যায় না ওদিকে। চারদিকে জঙ্গল। সাপটাপ থাকতে পারে।'

'সাপের ভয় আমার নেই খোকনদা। আমার কাছে বেশি জরুরি কালীভক্তির আড়ালে চাপা পড়া ইতিহাস উদ্ধার করা।'

'কী বলতে চাইছিস তুই?'

অতঃপর বিদুর আমাকে যা বলেছিল, সেই কথাগুলো বলল। খোকনদা বলল, 'দ্যাখ বিদুর, তোরা ধীমানের বন্ধু। জেনেশুনে আমি তোদের বিপদে ফেলতে পারি না। তাছাড়া মাকে পেয়েই আমরা খুশি। ইতিহাস নিয়ে আমাদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই।'

এরপর আর কথা চলে না। কিন্তু বিদুর এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। রাতেই ও ধীমানকে ফোন করল। সব কথা বলে বলল, 'খোকনদাকে রাজি করাতেই হবে ধীমান। আমার অনুমান, তোরা এতকাল যেভাবে বুঝেছিস, ঘটনাটা ঠিক সেভাবে ঘটেনি।'

কলেজে পড়ার সময় বিদুর একবার ভারি অদ্ভুতভাবে একটি রহস্যজনক চুরির কিনারা করেছিল। সেই থেকেই ধীমান বিদুরের ভক্ত। তাছাড়া গঙ্গাধরপুরে জন্মালেও ধীমানের মানসিকতা খোকনদাদের থেকে আলাদা। তাই ওকে বোঝাতে বেশি সময় লাগল না।

পরেরদিন রবিবার। সকালেই ফোন করল ধীমান। খোকনদা শুরুতে তর্জন-গর্জন করলেও শেষমেশ রাজি হয়ে গেল। তবে বিদুরকে একলা ছাড়ল না। ঠিক হলো আমরা তিনজন যাব। আমি, বিদুর আর খোকনদা।

হালকা ব্রেকফার্স্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। পুরনো মন্দিরে কেউ যায় না বলে সরাসরি কোনও রাস্তা নেই। বাস রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ যাবার পর দেখলাম খোকনদা বাঁদিকে একটা ইটবাঁধানো রাস্তা ধরল। সে রাস্তার একদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। খোকনদা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল।

আমার বেশ গা-ছমছম করছিল। সেটা সম্ভবত পুরনো মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অলৌকিকতার কারণে। — 'মন্দিরে যাওয়ার আর কোনও রাস্তা নেই খোকনদা?'

রাস্তা দুটো। একটা এই বাঁকিপুরের জঙ্গল দিয়ে। অন্যটা গড়াইয়ের দিকে।

শুনেছিলাম, গড়াইয়ের সেই ডাকাতেকালীর ঘাট ভেঙে গেছে। তাই ওদিকটায় যাইনি।'

'খোকনদা একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। সত্যিই তুমি কখনও পুরনো মন্দিরে যাওনি?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন! বললাম তো যাইনি।'

'না গেলে কেউ এত কনফিডেন্টলি বেরিয়ে পড়তে পারে? উঁহু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

খোকনদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একবার গিয়েছিলাম। কথাটা জানতে পেরে বাবা খুব রাগ করেছিলেন। তারপর আর যাইনি।'

বিদুর এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ হাঁটছিল। এবার বলল, 'তুমি ডাকাতে কালীর ঘাটের কথা বলছিলে না? গড়াই মন্দিরের কাছ দিয়েই বয়ে যেত নাকি?'

'মন্দির থেকে গড়াইয়ের দূরত্ব তিরিশ-চল্লিশ ফুট।'

লক্ষ্য করলাম বিদুরের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কী কারণে অবশ্য জানি না। গড়াই নিশ্চয়ই চল্লিশ ফুট লাফ দিয়ে বন্ধ মন্দিরে ঢুকে পড়েনি।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর জঙ্গল বেশ পাতলা হয়ে গেল। সামনে অনেকটা ঘাসে ঢাকা জমি। ত্রিসীমানায় কোনও লোকালয় নেই। খোকনদা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে রং সাইডে চলে এসেছি। এরকম তো হওয়ার কথা নয়।'

বিদুরের চোখ বাইনোকুলারে। ও বলল, 'আমরা ঠিক সাইডেই আছি খোকনদা। এই যে দ্যাখো—'

খোকনদা দেখল। আমিও দেখলাম। একটা ঘরের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। জোরে পা চালিয়ে আমরা মিনিটদশেকের মধ্যে নারানঠাকুরের সাধনভূমিতে পৌঁছে গেলাম।

জায়গাটা গাছ-গাছালিতে এমনভাবে ঢাকা যে মন্দিরের চূড়াটা চোখেই পড়ে না। খুব উঁচু না হলেও একটা চূড়া আছে। ঝোপঝাড় পেরিয়ে আমরা এগোলাম। মন্দিরের প্রধান ফটকের শুধু লোহার ফ্রেমটা টিকে আছে। পাল্লা উধাও। খোকনদা চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে ভেতরে ঢুকল। পিছনে আমরা।

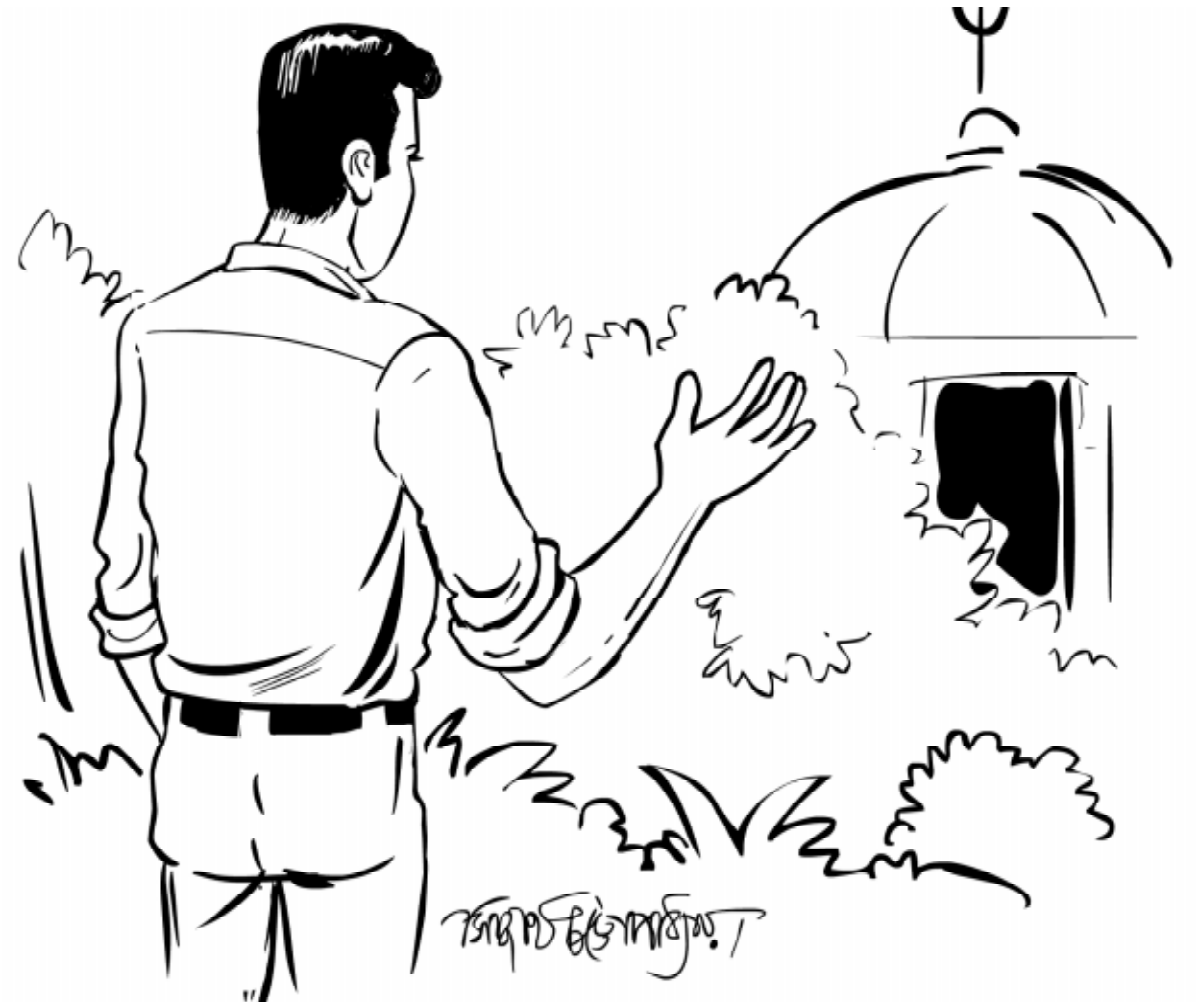

কিন্তু একী! আড়াইশো বছর ধরে পরিত্যক্ত মন্দির এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় নাকি? দেওয়ালে পলেস্তারার লেশমাত্র নেই, চূড়ার ফাঁপা অংশে বিপজ্জনক ফাটল, চুন-সুরকির প্রলেপ উঠে গিয়ে মেঝের ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। অথচ কোথাও এককণা ধুলো নেই। এটা কী করে সম্ভব হয় জানি না।

বিদুর দেখলাম মন দিয়ে কী যেন দেখছে। দেখার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। শুধু বেঢপ সাইজের বেদীটাই যা পড়ে আছে। নতুন মন্দিরে আমরা কালীঠাকুরের প্রতিমা দেখেছি। চারফুটের বেশি লম্বা হবে না। ওই প্রতিমাই তো এখানে ছিল। অথচ এখানকার বেদী অস্বাভাবিক চওড়া। নারানঠাকুরের স্ট্যাচুর নীচের বেদীর কথা মনে পড়ে গেল। সেই সময়ের লোকেরা এমন প্রমাণ সাইজের বেদী কেন বানাতো কে জানে!

'এগুলো কী খোকনদা?'

বেদীর ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বিদুরের গলা শুনে সম্বিত ফিরল। দেখলাম ওর হাতে কয়েকটা বিড়ির টুকরো। খোকনদা অবাক হয়ে বলল, 'এসব এখানে এলো কী করে? এখানে তো কেউ আসে না!'

বিদুরের ঠোঁটের কোণে হাসি। সে কিছু না বলে বেদীর পিছনদিকে চলে গেল। মন্দিরের পিছনের দেওয়াল আর বেদীর সঙ্গে ফুট তিনেকের ফাঁক। সেখানে কিছু একটা দেখে ও হো-হো করে হাসল। তারপর নীচু হয়ে একটা দিশি মদের বোতল কুড়িয়ে খোকনদাকে দেখিয়ে বলল, 'এবার বুঝতে পারছ তো এখানে লোকজনের দিব্যি যাতায়াত আছে! মন্দিরের ভেতরের চেহারা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

মন্দির দেখার পর আমরা পিছন দিকে চললাম। মন্দিরের পিছনের জমি বেশ ঢালু। ঢালের দৈর্ঘ্য অন্তত কুড়ি ফুট। লক্ষ্য করলাম এদিকে গাছপালা বিশেষ নেই। ঘাসও কম। ঢাল শেষ হবার পর একটা আয়তাকার সমতল। সেটাও দশ ফুটের কম নয়। খোকনদা বলল, 'বাবার কাছে শুনেছি এই ঢালু জমিকে বলা হত নাবাল। আর নাবালের পর এই যে সমতল জমিটা দেখছিস, একে বলা হত নাবালের চরা। আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানিস, গড়াইয়ে যখন জোয়ার আসত তখন জল নাবালের চরা পর্যন্ত এসে আটকে যেত। নাবালের ঢাল পেরিয়ে মন্দির পর্যন্ত যেতে পারত না।'

বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। যেন এটা একবিংশ শতাব্দী নয়, অষ্টাদশ শতাব্দী। কিছুক্ষণ পরেই গড়াইয়ে জোয়ার আসবে এবং নারানঠাকুর নাবালের ঢালে দাঁড়িয়ে সেই অনন্ত জলরাশি দেখতে দেখতে তাঁর ইষ্টদেবীকে প্রণাম করবেন।

ধ্যানভঙ্গ করল বিদুর, 'খোকনদা, গড়াইয়ে বান আসত না?'

'ঠিক বলতে পারব না রে। তবে বৃন্দাবন কাকা জানতে পারেন।'

'বৃন্দাবন কাকা মানে বৃন্দাবন দাস, তাই না? শ্রীমন্ত দাসের বংশধর।'

'হ্যাঁ। বয়েস হয়েছে বৃন্দাবন কাকার। আগে এখানকার একটা স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন। রিটায়ার করার পর নানা সূত্র থেকে গঙ্গাধরপুরের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। একটা বইও লিখেছেন। গঙ্গাধরপুরের প্রাচীন ইতিহাস।'

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর একটা ঘাট চোখে পড়ল। দূরে শীর্ণকায় গড়াই বয়ে যাচ্ছে। গড়াইয়ের মূল খাতের সত্তর ভাগই শুকনো। দেখতে ভালো লাগে না।

খোকনদা বলল, 'এই সেই ডাকাতে কালীর ঘাট। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে ডাকাতরা এই ঘাটে স্নান করত। শুনেছিলাম ঘাটটা ভেঙে গেছে। কিন্তু কয়েকটা ফাটল ছাড়া তো কিছুই চোখে পড়ছে না।'

আমরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। ঘাটের দুদিকের পাড় মজবুত করে বাঁধানো। ডানদিকের গাঁথুনিটা চোখে পড়ে। কিন্তু বাঁদিকটা বট-অশ্বত্থের ঝুরিতে এমনভাবে ঢাকা যে কিছুই দেখা যায় না।

বিদুর অনেকক্ষণ ঘাটে বসে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'চলো, এবার ফেরা যাক।'

বাড়ি ফিরে এলাম। বিদুর গম্ভীর। খোকনদার বোধহয় কিছু জিজ্ঞাসা করা ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বিদুর তেমন সাড়াশব্দ করল না।

।। চার ।।

ভেবেছিলাম বিদুর বোধহয় আজ বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ও সারাদিন পুরনো মন্দিরে কাটিয়ে দিল। দুপুরে বেরোবার সময় বলল, 'তোর যাওয়ার দরকার নেই। তেমন কিছু হলে আমি তোকে ফোন করব।' আমি টুকাইয়ের ছড়া শুনলাম। বৌদির সঙ্গে গল্প করলাম। বিকেলে নতুন মন্দিরে গিয়ে দেখলাম বিদুর নারানঠাকুরের স্ট্যাচুর সামনে বসে আছে।

'কী রে কিছু পেলি?'

'হাওয়া কোথা দিয়ে আসছে বুঝতে পারলাম না।'— বিদুর অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল।

'হাওয়া! সে আবার কী?'

বিদুর কিছু বলল না। রাতে খাবার সময় আমি আর খোকনদা কথা বলে গেলাম। বিদুর চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল।

ভূতের মতো একলা সিগারেট টেনে আমি শুয়ে পড়লাম। বিদুর তখনও বারান্দায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মধ্যরাতে বাথরুমে যাব বলে আলো জ্বেলে দেখি বিদুরের বিছানা খালি।

বাথরুমেও নেই। কোথায় গেল এত রাতে? ফোন করতে গিয়ে চোখে পড়ল ওর ফোন বালিশের পাশে পড়ে।

আধঘণ্টা পর যখন আমি খোকনদাকে খবর দেব কিনা ভাবছি, বিদুর গদাইলশকরি চালে ঘরে ঢুকে বলল, 'পাঁচ মিনিট আগে যেতে পারলে লোকদুটোকে ধরতে পারতাম। একটুর জন্য ফস্কে গেল।'

কারা ফস্কে গেল কিছুই বুঝলাম না। আমার ভ্যাবাচাকা মূর্তি দেখে বিদুর ঘটনাটা খুলে বলল। আমি শুয়ে পড়ার পর বিদুর বারান্দায় পায়চারি করছিল। তখনই ও লোকদুটোকে দেখে। গঙ্গাধরপুর রোড গড়াইয়ের পাড় ছুঁয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে। রাস্তায় আলো আছে। এবাড়ির বারান্দা থেকে রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। লোকদুটো ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারের ব্যারিকেড টপকে পাড়ে নেমে যায়। বিদুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গড়াইয়ের পাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের দেখতে পায়নি।

'ওরা কোথায় যেতে পারে কিছু বুঝতে পারলি?'

বিদুর হাসল, 'সেটা বুঝলে তো সেখানে চলেই যেতাম। ওদের হাতে টর্চ ছিল। গড়াইয়ের খাত ধরে ওরা যদি দূরে কোথাও যেত তাহলে টর্চের আলো দেখে আমি ট্রেস করে ফেলতাম। ওরা কাছাকাছি কোথাও শেল্টার নিয়েছে।'

'কী করে বুঝলি?'

'রাস্তা থেকে গড়াইয়ের পাড়ে নেমে বাঁদিকে কিছুটা হাঁটলেই ডাকাতে কালীর ঘাট। আমি কাল গিয়ে দেখে এসেছি। ইনফ্যাক্ট, আমি কাল ফেরার সময় পাড় দিয়ে হেঁটে এসেই রাস্তায় উঠেছিলাম। লোকদুটো যদি ঘাটের সিঁড়িতে বসে থাকে তা হলে রাস্তা থেকে আমি ওদের দেখতে পাব না।'

'তাহলে ওরা নির্ঘাত পুরনো মন্দিরে গেছে।'

'হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন যাবে? যেহেতু আমরা পুরনো মন্দিরে দিশি মদের বোতল পেয়েছি, তাই যদি ধরে নিই নেশাভাঙ্গ করাটাই উদ্দেশ্য, তাহলে আমি বলব মাঝরাতে অতবড়ো ব্যাগ নিয়ে কেউ ওসব করতে যায় না।'

অকাট্য যুক্তি। চুপ করে গেলাম। বিদুর বলল, 'আমার অনুমান ওরা কোনও ক্রিমিনাল অ্যাক্টের সঙ্গে জড়িত। তাই ওদের খোঁজখবর নেওয়াটা জরুরি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুই তো ইতিহাসের মিসিং লিংক খুঁজছিস। তাতে এই লোকদুটো এত ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠছে কেন?'

বিদুর হাই তুলে বলল, 'খুব ঘুম পাচ্ছে অমিত। চল শুয়ে পড়া যাক।'

বুঝলাম কিছু বলবে না। অগত্যা আমিও শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু নেই। আজও আমি কোথাও বেরোব না। বিদুর যা পারে করুক। কোনও মন্দিরেই আমার আর দেখার কিছু নেই।

দিনটা বিশুদ্ধ আলসেমি করে কেটে গেল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আরাম করে সিগারেট টানছি, বিদুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, 'আজ কিন্তু তোকে রাত জাগতে হবে অমিত।'

'খামোখা রাত জাগতে যাব কেন?'

'কারণ লোকদুটো আজও এদিকে আসছে। হাতে কালকের সেই ব্যাগটা। সুতরাং আমাদের এখনই বেরোতে হবে। কুইক।'

ঘুম মাথায় উঠল। বিদুর নৈশ অভিযানে যেতে বলছে মানে কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে। আগেও দু-একবার দেখেছি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা ব্যারিকেডের ধারে চলে গেলাম। লোকদুটো তখনও দূরে। গাছগাছালির আড়ালে। আমাদের দেখতে পাবে না।

এক জায়গায় ব্যারিকেডটা একটু ভাঙা। বিদুর বলল, 'কাল রাতে ওরা এখান দিয়েই পাড়ে নেমেছিল। সেটাই সুবিধাজনক। নয়তো ব্যারিকেডের ওপর উঠে লাফ দিতে হবে। ব্যাগটা ভারি হলে তা সম্ভব নয়। আজ ওদের আগে আমাদের নামতে হবে।'

বিদুর নেমে গেল। দেখাদেখি আমিও, চাঁদনি রাত। গড়াইয়ের খাল হিরের নেকলেসের মতো জ্বলছে। বাঁদিক ঘুরে কিছু দূর যেতেই চোখে পড়ল ডাকাতে কালীর ঘাট।

'তুই কি শিয়োর, ওরা এখানেই আসবে?'

'এখানে আসবে কিনা জানি না, তবে আমার অনুমান এদিকে আসবে।'

ঘাটটা একটু খাড়া ধরনের। ধাপগুলো চওড়া আর উঁচু। অনেকটা বেনারসের মতো। আমরা একদম ওপরের ধাপে উঠে দুদিকে ঘাপটি মেরে বসলাম।

বিদুরের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। লোকদুটো এদিকেই এল। কিন্তু ঘাটে না উঠে সোজা চলে গেল। অর্থাৎ ঘাটের বাঁদিকে। মানেটা সহজ। পুরনো মন্দির ওদের গন্তব্য নয়।

বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বিদুর নীচের ধাপে নেমে গেল। পিছনে আমি। উপুড় হয়ে শুয়ে কুমিরের মতো গলা বাড়িয়ে দেখছিলাম। এখান থেকে দেখতে অসুবিধা হয় না। লোকদুটো গড়াইয়ের খাত যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার কংক্রিটের দেওয়ালের সামনে দাঁড়াল। আগের দিনই দেখেছিলাম এদিকের দেওয়ালের প্রায় সবটাই বট-অশ্বত্থের ঝুরিতে ঢাকা। ঝুরির নীচে কিছু থাকতে পারে ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। কিন্তু লোকদুটো দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে আলগা ঝুরিগুলো

সরাতেই চোখে পড়ল বিশাল একটা গর্ত। প্রমাণ সাইজের একজন মানুষও ওই গর্তে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বললাম, 'ওটা কী বিদুর?'

বিদুর ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'কথা বলিস না। চুপচাপ দেখে যা।'

দুজনের মধ্যে একজন ব্যাগ নিয়ে গর্তের ভেতরে চলে গেল। অন্যজন রইল পাহারায়।

বিদুর বোধহয় এই সুযোগটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ঘাট থেকে নেমে ও এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। তারপর পিছন থেকে ঝাপটে ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল হাতদুটো। বিদুরের নিয়মিত জিম করা শরীর। ওর শক্তির সঙ্গে যোঝা সহজ কথা নয়।

'এবার বলো তো বাছাধন তোমরা কে? কী করতে রোজ এখানে আসো?'

'তা নিয়ে আপনার কী দরকার?'

'আমরা পুলিশের লোক। লালবাজার থেকে আসছি। কথার উত্তর না দিলে এইখানেই পুঁতে দিয়ে যাব।'

ভেবেছিলাম লোকটা বোধহয় আবার তেড়িয়া হয়ে কিছু বলবে। কিন্তু লালবাজারের নাম শুনে বেশ মুষড়ে পড়ল।— 'আমি কিছু জানি না স্যার। সব শিবেনদা জানে।'

'শিবেনদা কে?'

লোকটা যা বলল তা এইরকম— শিবেন পাল দিশি মদের কারবার করে। নস্করপাড়ায় তার ঠেক আছে। কিন্তু পুলিশ ঝামেলা করে বলে বিক্রি না হওয়া মদের বোতল ও এই গর্তে রেখে যায়। এটা তার গোডাউন বলা যেতে পারে। গ্রামের লোকেরা গর্তের কথা জানে না বলে কোনও সমস্যা হয় না।

পুরনো মন্দিরের সেই দিশি মদের বোতলটার কথা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তোমরা তার মানে পুরনো মন্দিরেও যাও?'

'না স্যার, ওখানে আমরা যাই না। গেলে মা কুপিত হন। তবে শিবেনদা যায়। মাল-ফাল খায়। ফুর্তি করে।'

যে লোকটা গর্তের ভিতরে গিয়েছিল এই সময় ফিরে এল। বিদুর তৈরি ছিল। ওকেও মাটিতে ফেলে হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর আমাকে বলল, 'তুই এদের কাছে থাক। আমি আসছি।'

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই বিদুর ক্যাঙারুর মতো লাফ দিয়ে গর্তে ঢুকে গেল। আমার সামনে লোকদুটো হাতবাঁধা অবস্থায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে। নিতান্তই নিরীহ চেহারা। অসামাজিক কাজ করে বলে চোখেমুখে কৃত্রিম কাঠিন্য ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু লালবাজারের অফিসারদের সামনে ট্যাঁ ফোঁ করার মুরোদ নেই। তাই নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরালাম।

বিদুর ফিরল প্রায় কুড়ি মিনিট পর। দেখে মনে হলো বেশ চিন্তিত। লোকদুটো হাঁ করে ওকে দেখছিল। বিদুর বলল, 'আজ তোমাদের ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ফের যদি এখানে দেখি তো সাত বছরের জন্য ঢুকিয়ে দেব।'

ছাড়া পেয়ে লোকদুটো দৌড়ে পালাল।

আমার তর সইছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'গর্তের মধ্যে কিছু পেলি?'

'রহস্য আরও বেড়ে গেল রে অমিত। ওটা যে সাধারণ গর্ত নয় সেটা আমি বাইরে থেকে দেখেই বুঝেছিলাম। গর্তের মুখে পাড়ের দেওয়ালের গাঁথুনি একদম সার্কুলার। অর্থাৎ গর্ত আগেই ছিল। দেওয়াল গাঁথা হয়েছে পরে, গর্ত বাঁচিয়ে। এখন ভেতরে ঢুকে বুঝলাম ওটা একটা সুড়ঙ্গ।'

'মাই গুডনেস! কী বলছিস তুই?'

'ইয়েস। কিছুদূর যাবার পর সুড়ঙ্গটা খাড়া হয়ে ওপরে উঠেছে। লেন্থ আন্দাজ তিরিশ-চল্লিশ ফুট। কিন্তু রহস্যটা অন্য জায়গায়। যে কোনও সুড়ঙ্গের দুটো মুখ থাকে। এটির ওদিকের মুখটি বন্ধ। প্রশ্ন হলো, প্রথম থেকেই বন্ধ ছিল নাকি ধস-টস নেমে বন্ধ হয়েছে?'

'খোকনদা জানতে পারে।'

'মনে হয় না। শুনলি না লোকটা বলল গ্রামের কেউ এই গর্তের কথা জানে না।'

ফিরে চললাম। তিনটে বেজে গেছে। চারদিকে আধিভৌতিক শূন্যতা। হয়তো এরই মধ্যে কোথাও বিদুরের প্রশ্নের উত্তর আছে। সময় হলেই জানতে পারা যাবে। অথবা কোনওদিনও জানা যাবে না।

।। পাঁচ ।।

'সুড়ঙ্গ! গড়াইয়ের পাড়ে! এসব তুই কী বলছিস বিদুর?'

কাল রাতের বিবরণ শুনে খোকনদা একেবারে হাঁ হয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছি। বাড়িতে বানানো কচুরি আর চা খেতে খেতে কথাবার্তা হচ্ছে।

বিদুর বলল, 'হ্যাঁ খোকনদা, আমরা কাল দেখে এসেছি। সুড়ঙ্গটার একটা মুখ খোলা, অন্যটা বন্ধ। প্রবলেম সেটাই। কারণ বিপদের সময় পালানোর জন্যই লোকে সুড়ঙ্গ বানায়। কিন্তু একটা মুখ বন্ধ থাকলে সে যুক্তি টেকে না।'

'ওই লোকদুটো কিছু বলতে পারল না?' খোকনদার ইঙ্গিত শিবেনের চ্যালাদের দিকে।

'নেসেসিটি ইজ দা মাদার অব ইনভেনশন, কথাটা জানো তো? ওদের উদ্দেশ্য মদের বোতলগুলো নিরাপদে রাখা। সেটা সুড়ঙ্গের দশ হাত দূরত্বের মধ্যে রাখলেও চলে। ওরা এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?'

মীমাংসাসূত্র বেরোল না। আমার মনে

হলো, বিদুর বোধহয় অসম্ভবের পিছনে ধাওয়া করছে। আড়াইশো বছর আগে সেই ভয়ঙ্কর রাতে মন্দিরের ভেতর জল কীভাবে ঢুকেছিল আজ আর জানা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত আমাদের হয়তো হতাশ হয়েই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

বিদুর হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা খোকনদা, পুরনো মন্দিরে গুপ্তধন কোথায় থাকত তোমার কোনও ধারণা আছে?'

খোকনদা হেসে বলল, 'না রে। শুধু আমি কেন, গঙ্গাধরপুরের কারোরই নেই। তোর কী মনে হয় গুপ্তধনের সঙ্গে সুড়ঙ্গের সম্পর্ক আছে?'

'ইতিহাস তো তাই বলছে। যেসব মন্দিরে গুপ্তধন থাকত, সেখানেই সুড়ঙ্গ কাটার রেওয়াজ ছিল। যাতে ডাকাত-ফাকাত পড়লে গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।'

'ডাকাতদের মন্দিরে কীভাবে ডাকাত পড়বে?' এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'ভুলে যাস না অমিত এখান থেকে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার। সেসময় আরাকান থেকে মগেরা এসে প্রায়ই লুটপাট করত। একটা গ্রাম্য ডাকাত দলের পক্ষে মগেদের মতো অর্গানাইজড্ লুটেরাদের মোকাবিলা করা সম্ভব কি?

খোকনদা বলল, 'আমি তো বলছি তুই একবার বৃন্দাবন কাকার সঙ্গে দেখা কর। উনি অনেককিছুর খবর রাখেন। কবে যাবি বল, আমি নিয়ে যাব।'

ঠিক হলো আজ সন্ধ্যেবেলায় যাওয়া হবে। ওই সময় বৃন্দাবন দাস আহ্নিক করে বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসেন। অন্যসময় শোবার ঘর থেকে বড়ো একটা বেরোন না। বাতে প্রায় পঙ্গু। বেশি নড়াচড়া করতে পারেন না।

খোকনদা বেরিয়ে যাবার পর ঘরে এসে সিগারেট ধরালাম। বিদুর একটা মোটা ডায়েরিতে কীসব লিখছে। টুকাইয়ের গলা শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছড়া কাটছে। আমি লক্ষ্য করছি খোকনদা বাড়িতে না থাকলে ওর ছড়া কাটার মাত্রা বেড়ে যায়।

বিদুর হঠাৎ ডায়েরি বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে গেল। শুনতে পেলাম টুকাইকে বলছে, ছড়াটা আর একবার বলো তো সোনা।'

টুকাই বলতে লাগল—

'কালীঠাকুর কালীঠাকুর
নদী কোথায় বলো
কালীঠাকুর বলেন হেসে
পাতালদেশে চলো
চারটে ছাগল আসছে ছুটে
ঘাসের গন্ধ শুঁকে
নদীর বুকে ঘাস গজাল
ছাগল খাবে সুখে।

একই ছড়া প্রায় বারতিনেক শুনে বিদুর যখন ঘরে ঢুকল তখন তার চেহারা পাল্টে গেছে। চাপা খুশিতে চকচক করছে চোখ। ঠোঁটের কোণে হাসি। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী রে হাসছিস কেন?'

'আমি একটা আস্ত ইডিয়ট রে অমিত। হাতের কাছে সব সাজানো অথচ আমি দেখতে পাইনি।'

আমার বেশ রাগ হয়ে গেল, 'কী বলতে চাস স্পষ্ট করে বল। বারবার হেঁয়ালি আমার ভালো লাগে না।'

'হেঁয়ালি নয় রে। টুকাইয়ের ছড়ার মধ্যে নারানঠাকুরের পুরো গল্পটাই ধরা রয়েছে। এমনকী সুড়ঙ্গের সঙ্গে যে মন্দিরের যোগ রয়েছে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তারও।'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। যে ঘটনা সম্পর্কে গঙ্গাধরপুরে এত গোপনীয়তা, একটা ছেলেভুলানো ছড়ায় তার কথা বলে দিলে তো তা ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আমার যুক্তি শুনে বিদুর বলল, 'সেইখানেই তো ছড়া লেখকের কৃতিত্ব। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। হয়তো তার আশা ছিল কেউ না কেউ ছড়ার অর্থ বুঝতে পারবে।'

'বেশ, তোর ব্যাখ্যাটা আগে শুনি।'

'ছড়ায় জানতে চাওয়া হচ্ছে, নদী কোথায়? কালীঠাকুর বলছেন পাতাল দেশে। পাতাল অর্থাৎ মাটির নীচে। অথচ নদী মাটির নীচে থাকে না। এখানেই এসে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের কথা। তারপর ধর চারটে ছাগল। বিরাজনারায়ণ চারজন লেঠেল পাঠিয়েছিল। ব্যঙ্গ করে তাদের ছাগলের প্রতীকে দেখানো হয়েছে। পার্বতী অথবা গুপ্তধন এখানে ঘাস। ঘাসের সঙ্গে ছাগলের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। এখানেও সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। সব শেষে নদীর বুকে ঘাস গজানোর প্রসঙ্গ। নদীর বুকে ঘাস গজায় না। তাহলে চারটে ছাগল ঘাস খেতে কোথায় গেল?'

বিদুরের ব্যাখ্যা শুনে আমার রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল। ওর প্রশ্নের উত্তর দেব কী, কথাই বলতে পারলাম না।

'মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়া গড়াইয়ের জলে ডুবে চার লেঠেলই মারা গিয়েছিল অমিত। পরে চারটে বডি গড়াইয়েই ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ছড়ার শেষ লাইন, নদীর বুকে ঘাস গজাল, ছাগল খাবে সুখে— সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে।'

'কিন্তু মন্দিরে জল ঢুকল কোথা থেকে?'

'সুড়ঙ্গ দিয়ে। মন্দিরের সঙ্গে সুড়ঙ্গের কানেকশন এখনও আমরা পাইনি বটে, কিন্তু আমার অনুমান পেয়ে যাব।'

'আর নারানঠাকুরের কী হলো?'

'ছড়ায় যখন তার উল্লেখ নেই, ধরে নিতে হবে তিনি জীবিতই ছিলেন। সম্ভবত বিরাজনারায়ণের কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।'

আমি আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বিদুর বলল, 'আর কোনও কথা নয় অমিত। মনে আছে তো,

সন্ধ্যেবেলায় বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট! তার আগে দুপুরে আমরা একবার পুরনো মন্দির যাব।'

একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। জড়িয়ে পড়লাম অষ্টাদশ শতাব্দীর এক রহস্যে। বিদুর অনেকটাই রহস্যভেদ করে ফেলেছে। বাকিটাও নিশ্চয়ই পারবে। ছড়ার মানে জানার পর আমার আর কোনও সংশয় নেই।

দুপুরবেলায় বিদুরের সঙ্গে পুরনো মন্দিরে হাজির হলাম। কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখ খোঁজার পরিবর্তে ও বেদীর ওপর বসে সিগারেট ধরাল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী রে! ওইভাবে বসে থাকলে কাজ হবে।?'

বিদুর অন্যমনস্ক, 'সুড়ঙ্গটা কোথায় থাকতে পারে বলে তোর মনে হয়?'

'সম্ভবত মেঝের নীচে।'

'তা হলে তো লেঠেলরা মন্দিরে ঢোকার আগে মেঝে খুঁড়ে রাখতে হয়। আর লেঠেলরা ঢুকে যদি দেখে মেঝে খোঁড়া তাহলে কি ওদের সন্দেহ হবে না?'

বিদুরের যুক্তি অস্বীকার করতে পারলাম না। দ্বিতীয় কোনও সম্ভাবনার কথাও মাথায় এল না। অগত্যা চুপ করে থাকাই শ্রেয়। বিদুর বলল, 'সুড়ঙ্গের মুখ এমন জায়গায় আছে যার কথা কেউ ভাবতেই পারবে না। কিন্তু প্রয়োজনে সেই মুখ সহজেই খুলে ফেলা যাবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেরকম জায়গা ওই মন্দিরে কোথায়?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিদুর পকেট থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করল। ওই ব্যাগের ভেতর ছুরি কাঁচি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ইত্যাদি থাকে। বিদুর ম্যাগনিফাইং গ্লাসে চোখ রেখে বেদীর সামনে পিছনে দুই ধারে কী যেন দেখতে শুরু করল।

ওর উদ্দেশ্য বিধেয় কিছুই না বুঝে বললাম, 'ওটা আবার কী শুরু করলি?'

'হাওয়া কোথা দিয়ে আসছে তাই দেখছি।'

হাওয়ার কথা বিদুরের মুখে আগেও একবার শুনেছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, 'দুটো দরজার একটারও পাল্লা নেই। জানালার অবস্থাও একইরকম। হাওয়া কোথা দিয়ে আসছে এরপরও বুঝতে পারছিস না?'

বিদুর আমার কথার কোনও জবাব দিল না। মিনিট পাঁচেক পর ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ তো তুই কিছু দেখতে পাস কিনা।'

গ্লাসে চোখ লাগালাম। বেদীর উচ্চতা চার ফুট মতো। ওপর থেকে আন্দাজ আড়াই ফুট নীচে একটা সরু ফাটল চোখে পড়ল। ফাটলটা একটুও না বেঁকে বেদীর সামনে থেকে দুই ধার দিয়ে পিছনে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। কারণ এরকম জ্যামিতির নিয়ম মেনে ফাটল ধরে না।

'কী বুঝলি?' বিদুর জিজ্ঞাসা করল।

'ফাটল বলেই তো মনে হচ্ছে।

'তার মানে কিছুই বুঝিসনি।'

অস্বীকার করব না, বুঝতে পারিনি। তবে বিদুর বোধহয় কিছু একটা অনুমান করেছে। দেখলাম ছুরি দিয়ে চেঁছে ও বেদীর ওপরের চুনসুরকির আস্তরণের অনেকখানি তুলে ফেলল। লালচে রঙের আভাস পাওয়া মাত্র বুঝলাম ইট বেরিয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে অবাক করা কাণ্ডটা ঘটল এরপর। বিদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ওই আড়াই ফুট নীচের ফাটলের ওপর হাত রেখে তুলে ফেলতে চাইল বেদীটা। একচুলও নড়াতে পারল না।

অবাক হয়ে বললাম, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

বিদুরের মুখে কুলুপ। বারদুয়েক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে ও ফোন করল খোকনদাকে, 'তিন-চারজন শক্তিশালী লোককে নিয়ে এখনই একবার পুরনো মন্দিরে চলে এস। — ফোনে নয়, এখানে এস তারপর বলব।'

ফোন রেখে বিদুর আবার গম্ভীর। চোখ বেদীর ওপর। মাঝে মাঝে বেদীর ইটে আঙুল ঘষে কীসের যেন গন্ধ শুঁকছে। একটু আগে হলে হয়তো এসব আমার পাগলামি বলে মনে হত। কিন্তু রহস্যভেদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে না গেলে বিদুর খোকনদাকে ফোন করে আসতে বলত না। তবে শক্তিশালী লোকের কেন প্রয়োজন সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। বেদীর নীচেই যদি সুড়ঙ্গের মুখ তাকে তা হলে তো ওটা ভেঙে ফেললেই হয়।

খোকনদা এল প্রায় আধঘণ্টা পরে। সঙ্গে তিনটে পালোয়ান গোছের লোক। বিদুর তখন সরু ফাটলটা ছুরি দিয়ে চেঁছে চওড়া করার চেষ্টা করছে। খোকনদা বলল, 'বেদী কি ভাঙতে হবে বিদুর?'

'না। শুধু একটা আড়াই ফুট মোটা লোহার প্লেট সরাতে হবে।'

'লোহার প্লেট! কী বলছিস তুই? এটা তো বেদী।'

'হ্যাঁ বেদী। কিন্তু ওপরে রয়েছে একটা লোহার প্লেট। বেদীর ওপর থেকে আড়াই ফুট নীচে একটা সরু রেখা দেখে আমার সন্দেহ হয়। অমিত ভেবেছে ওটা ফাটল। আসলে ওটা ইটের গাঁথনি আর লোহার প্লেটের জোড়। প্লেটটা সরালেই তোমরা বুঝতে পারবে।'

চারজন চারদিকে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় লোহার প্লেটকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হলো।

বিস্ফারিত চোখে দেখলাম বেদীর নীচে সুড়ঙ্গের দ্বিতীয় মুখ। প্রবল বেগে ধেয়ে আসা হাওয়ার ধাক্কায় বুঝলাম মন্দির থেকে সুড়ঙ্গ গিয়ে শেষ হয়েছে গড়াইয়ের পাড়ে।

বিদুর বলল, 'এই সেই সুড়ঙ্গ

খোকনদা। এখান দিয়েই মন্দিরে জল ঢুকেছিল।'

খোকনদা বলল, 'কিন্তু বিদুর, গড়াইয়ের জোয়ারের জল তো নাবালের চরা পেরিয়ে ওপরে উঠত না।'

'জানি। ওই একটি প্রশ্নের উত্তরই আমার এখনও জানা বাকি। আসা করছি বৃন্দাবন দাস এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

।। ছয়।।

বৃন্দাবন দাস যে বাড়িতে থাকেন, সেটি শ্রীমন্ত দাসের তৈরি। ভক্ত বৈষ্ণবের বাড়িতে যা যা থাকার কথা সবই আছে। রাধাকৃষ্ণের মন্দির, দোলমঞ্চ, নাটমন্দির পেরিয়ে আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম।

ঘরটি বেশ বড়ো। দেওয়ালে অজস্র ছবি। বেশিরভাগই অয়েল পেন্টিং। প্রতিটি ছবির নীচে যার ছবি তার পরিচয় লেখা। বিদুর মন দিয়ে ছবি দেখছিল।

খোকনদা বলল, 'এগুলো বৃন্দাবন কাকার পূর্বপুরুষদের ছবি। শ্রীমন্ত দাসের পর থেকে সকলের ছবি আছে।'

দেখতে দেখতে বিদুর ঘরের এক কোণে একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই ছবির নীচে পরিচয় নেই কেন?'

উঁকি দিয়ে দেখলাম এক সন্ন্যাসীর ছবি। চুলদাড়িতে মুখ প্রায় ঢাকা। কপালে রক্তচন্দনের টীকা। পোশাক তান্ত্রিকদের মতো। বৈষ্ণবের বাড়িতে তান্ত্রিকের ছবি দেখে অবাক হলাম।

বিদুর জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কার ছবি খোকনদা?'

'উনি মধুসূদন ভারতী।'

না, খোকনদা নয়। জবাব এল ভারী গলায়। পিছন ফিরে দেখলাম একটি মাঝবয়সি লোকের কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকছেন একজন সৌম্য চেহারার বৃদ্ধ। অনুমানে বুঝলাম ইনি বৃন্দাবন দাস। ওকে একটি সাবেক আরাম কেদারায় বসিয়ে মাঝবয়সী লোকটি বিদায় নিল।

খোকনদা বলল, 'এরা আমার ভায়ের বন্ধু বন্দাবন কাকা। বিদুর আর অমিত। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে।'

'তুই তো বলেছিস ওদের কথা। — তোমাদের মধ্যে বিদুর কে? সেই তো গোয়েন্দাগিরি করছে শুনলাম।'

বিদুর লজ্জা পেয়ে বলল, 'ঠিক গোয়েন্দাগিরি নয়। আসলে ইতিহাসের মিসিং লিংকগুলো খুঁজতে আমার ভালো লাগে।'

'বাহঃ! এক সময় আমিও খুঁজতাম। তা, কিছু পেলে নাকি?'

'পেয়েছি। তবে সেসব বলার আগে আমি আপনার কাছে দুটো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।'

'বেশ তো, বলো।'

'মধুসূদন ভারতী কি গঙ্গাধরপুরের লোক ছিলেন?'

বৃন্দাবন দাস কয়েক মুহূর্ত বিদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'উনি বেনারসের লোক। তবে শ্রীমন্ত দাসের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে মাঝে মাঝে গঙ্গাধরপুরে আসতেন। এখন যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে ওঁর মতো এক তান্ত্রিকের কীভাবে বা কোথায় বন্ধুত্ব হয়েছিল, আমি বলতে পারব না। ছোটবেলা থেকে আমরা ওসব কথা শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছি।'

'মধুসূদন ভারতী কি বেনারস থেকে এসে এই বাড়িতে উঠতেন?'

'না। উনি থাকতেন কালীমন্দিরে। শুনেছি ওর দেখাশোনা করত নারানঠাকুরের পুত্রবধূ পার্বতী।'

'আশ্চর্য! সেই সময় পার্বতীর মতো বিধবা মহিলা একজন সন্ন্যাসীর দেখাশোনা করতেন, কেউ কিছু বলত না?'

'কেন বলবে! উনি তো সন্ন্যাসী। ভোগবাসনার অনেক ঊর্ধ্বে। তাছাড়া গ্রামের বহু লোক তার কাছে আসত। অনেকে দীক্ষাও নিয়েছিল। পার্বতীও দীক্ষা নিয়েছিল ওঁর কাছে।'

বিদুর অর্থপূর্ণ হেসে বলল, 'তা হলে বোধহয় তাই হবে। এবার আপনার কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। শুনেছি, গড়াইয়ে জোয়ার এলে সেই জল নাবালের চরা পেরিয়ে ওপরে উঠত না। আমার প্রশ্ন, গড়াইয়ে বান আসত না?'

'পূর্ণিমা-অমাবস্যায় আসত বৈকি! কিন্তু বান এলেও জল নাবালের চরা পেরিয়ে ওপরে উঠত না। তার কারণটাও খুব সহজ। আমাদের পূর্বপুরুষরা নদীনালার দেশের মানুষ তো, ওরা নদীর চরিত্র খুব ভালো বুঝতেন। তাই দেখবে গড়াইয়ের পাড় প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু। বানের জল এত উঁচুতে উঠতে পারত না। তবে পাড় যদি নীচু হত কিংবা নীচের দিকে যদি জল ঢোকার রাস্তা থাকত তাহলে মন্দির-টন্দির সব ডুবে যেত।'

বিদুর হঠাৎ বৃন্দাবন দাসকে প্রণাম করে বলল, 'যে দুটো জট আমি খুলতে পারছিলাম না, আপনার কথায় তা পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

বৃন্দাবন দাস অবাক হয়ে বললেন, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু সব পরিষ্কার হবার পর তুমি কী সিদ্ধান্ত নিলে সেটা তো জানা দরকার।'

বিদুর কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বলল, 'আমার সিদ্ধান্ত আপনাদের বিশ্বাসকে আঘাত করতে পারে।'

'খোকন আমায় সব বলেছে বিদুর। আড়াইশো বছর আগের সেই রাতে মা কালীর আবির্ভাবের গল্পে তুমি বিশ্বাস করো না। এই নিয়ে অবশ্য একদিনই ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারপর তোমরা কী করেছ আমি জানি না। আমি পুরোটা শুনতে চাই।'

এই সময় সেই মাঝবয়সী লোকটি চায়ের ট্রে আর নিমকি নিয়ে ঘরে ঢুকল। চা খেতে খেতে গল্প শুরু হলো।

বিদুর প্রথমে গঙ্গাধরপুরের কালী মন্দিরের ইতিহাস শোনার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। তারপর বলল, 'আড়াইশো বছর আগে মন্দিরে যা ঘটেছিল তার পিছনে ছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় প্রধান ভূমিকা ছিল নারানঠাকুর, শ্রীমন্ত দাস এবং পার্বতীর। সঙ্গে ছিল কয়েকজন বাছাই করা বিশ্বাসী গ্রামবাসী। এদের মাধ্যমেই কালীঠাকুরের আবির্ভাবের মিথ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিরাজনারায়ণকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তার প্রয়োজন ছিল।

গঙ্গাধরপুরের ইতিহাস শোনার পরেই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মন্দিরে জল কোথা দিয়ে ঢুকল? চার লেঠেলের মৃতদেহই বা পাওয়া গেল না কেন? এখন আমরা এর উত্তর জানি। জল ঢুকেছিল সুড়ঙ্গ দিয়ে। মন্দিরের দরজা লোহার। তাই প্লাবনেও ভেঙে পড়েনি। এমনকী ভেতরের জল বাইরেও যায়নি। জলে ডুবে চারজনের মৃত্যু হওয়ার পর তাদের মৃতদেহ গড়াইয়ের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এসব কথা টুকাইয়ের ছেলেভুলানো ছড়া থেকে আমি জানতে পারি।'

খোকনদা বলল, 'টুকাইয়ের ছড়া! মানে ওই কালীঠাকুরের ছড়া? কীরকম একটু বল?'

ছড়ার অর্থ ব্যাখ্যা করে বিদুর বলল, 'এখন প্রশ্ন হলো ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছিল। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটা কথা মনে রাখা জরুরি। আড়াইশো বছর আগে যা ঘটেছিল, তার কোনও সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স আমাদের হাতে নেই। সুতরাং আমি যেভাবে সাজিয়েছি, ঘটনাটা ঠিক সেভাবেই ঘটেছিল এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। কমবেশি তফাত থাকতেই পারে। নারানঠাকুর এবং শ্রীমন্ত দাসের মনস্তত্ত্ব বিচার করে যা মনে হয়েছে আমি তাই বলছি।

'নারানঠাকুর এবং শ্রীমন্ত দাস দুজনেই চন্দনদাঁড়ির রতনকে চিনতেন। মন্দিরের গুপধনের কথা ও যে জানে, তাও তাদের অজানা ছিল না। নারানঠাকুর এও জানতেন, গঙ্গাধরপুর যতই ছোট গ্রাম হোক লম্পট বিরাজনারায়ণের গ্রাস থেকে বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। হয়েছিলও তাই। নিজে ডাকাতি না করলেও নারানঠাকুর ডাকাত বংশের সন্তান। অন্যায়ের প্রতিকার যে তিনি সাধারণ গৃহস্থের মতো করবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীমন্ত দাসের সঙ্গে তিনি বসলেন প্ল্যান করতে। বলা ভালো ফাঁদ পাততে।'

'ফাঁদ! কীসের ফাঁদ?' — বৃন্দাবন দাস অবাক হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ, ফাঁদ। পার্বতীর পালকির ফাঁদ। পালকির বেহারাদের পক্ষে যে চারজন শিক্ষিত লেঠেলের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, আশাকরি এ বিষয়ে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন। নারানঠাকুর সুকৌশলে রটিয়ে দিয়েছিলেন ওইদিন সন্ধ্যাবেলায় পার্বতী পালকিতে ফিরবেন। কিন্তু পার্বতী পালকিতে ছিলেন না। লেঠেলরা সেই ফাঁদে পা দেয়। ওদের দেখেই বেহারারা পালিয়ে গিয়েছিল। পাঁকা পালকি দেখে রতনরা ভেবেছিল পার্বতীও পালিয়ে গেছেন। পরের দিনই ওরা নারানঠাকুরের মন্দিরে হানা দেয়। নারানঠাকুর এটাই চেয়েছিলেন। ফাঁদ না পাতলে তিনি এত সহজে রতনদের টেনে আনতে পারতেন না।

'নারানঠাকুরকে শুধু বুদ্ধিমান বললে কিছুই বলা হয় না। মানুষের মনস্তত্ত্ব বিচারেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি জানতেন, রতনরা খালি হাতে গঙ্গাধরপুরে মেয়েদের মুক্তি দেবে না। সম্ভবত সে সময় ডাকাতে কালীর গুপ্তধনের ওপর অনেকের নজর ছিল। বিরাজনারায়ণেরও থাকতে পারে। তাই আলোচনার সময় রতন যখন গুপ্তধন দাবি করে বসল, তিনি অবাক হননি। শুধু রতনদের লোভ আরও বাড়িয়ে দেবার জন্য গুপ্তধন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হলো না। অতঃপর নারানঠাকুর প্রবেশ করলেন পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগে। দুদিন পর ওদের আসতে বললেন। কারণ, দুদিন পর ছিল অমাবস্যা। অমাবস্যায় কখন গড়াইয়ে বান আসে নারানঠাকুর জানতেন। তাই রাত বারোটার সময় ওদের আসতে বলা হলো।

ওরা এল। নারানঠাকুর তন্ত্রচর্চা করতেন। সুতরাং ওর মন্দিরে কারণবারি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সম্ভবত কারণবারি খাইয়েই চার লেঠেলকে নিস্তেজ করে দেওয়া হয়েছিল। ওরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে দেখে শ্রীমন্ত দাসের সহায়তায় নারানঠাকুর লোহার প্লেট সরিয়ে দেন। নারানঠাকুর শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। ওর স্ট্যাচু দেখেই সেটা বোঝা যায়। শ্রীমন্ত দাসও সম্ভবত যথেষ্ট শক্তি ধরতেন। কারণ যে কাজটা আজ আমরা চারজনে মিলে করেছি, সেটাই ওরা দুজনে করেছিলেন। প্লেট সরিয়ে ফেলার পর শ্রীমন্ত দাস মন্দির থেকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে আসেন তখন ওর সঙ্গে গ্রামের কয়েকজন লোক। ওরা দেখতে পায় একপিঠ খোলা চুলের একটি মেয়েকে। মেয়েটি কালীপ্রতিমা হাতে বেদীর পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গড়াইয়ের পাড়ে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি পার্বতী। পার্বতী চলে যাবার পর নারানঠাকুর মন্দিরের দুটো দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ করে দেন। সম্ভবত তার কিছুক্ষণ পর থেকেই মন্দিরে জল ঢুকতে শুরু করে। বিরাজনারায়ণের

লেঠেলদের আর্ত চিৎকার শুনেও গ্রামের লোকেরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়নি। কারণ ওরা জানত, নারায়ঠাকুর শুদ্ধাচারী তান্ত্রিক এবং গ্রামের শুভানুধ্যায়ী। তাই তিনি যা করবেন গ্রামের, বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের ভালোর জন্যই করবেন। আমার অনুমান, গ্রামের ওই বাছাই করা লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করেই নারানঠাকুর এবং শ্রীমন্ত দাস কালীঠাকুরের আবির্ভাবের তত্ত্ব খাড়া করেন। পরে তা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। বিরাজনারায়ণ সম্ভবত সুড়ঙ্গের কথা জানত না। এরকম একটি অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা শুনে সে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়।'

বিদুর দম নেবার জন্য থামল। আমি বললাম, 'রতনও কি সুড়ঙ্গের কথা জানত না?'

'সেটা বলা মুশকিল। তবে জানলেও সেটা কাজে আসেনি। কারণ, এই শ্রেণীর লোকেরা একটু আত্মম্ভরী টাইপের হয়। ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থাকে তো, তাই। দুজন প্রৌঢ় ওদের মেরে ফেলার প্ল্যান করতে পারে, সেটা বোঝার মতো কল্পনাশক্তি ওর ছিল না। থাকলে রাত বারোটার সময় দেখা করতে যেত না।'

বৃন্দাবন দাস এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিন্তু একজনের কথা এখনও বলোনি। নারানঠাকুরের কী হলো?'

বিদুর রহস্যময় হেসে বলল, 'বিরাজনারায়ণের কোপ থেকে বাঁচবার জন্য ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীমন্ত দাসই দিয়েছিলেন। তিনিই বেনারসে আশ্রম করে দেন। নারানঠাকুর সেখানে থাকতেন। অনেক বছর পর শ্রীমন্ত দাসের অতিথি হয়ে তিনি গঙ্গাধরপুরে ফেরেন। তখন তিনি আর নারানঠাকুর নন, মধুসূদন ভারতী।'

ঘরে আলপিন পড়লে বোধহয় তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। খোকনদার চোখদুটো ফুটবলের মতো হয়ে গেছে। বৃন্দাবন দাসও শ্রদ্ধা আর বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে বিদুরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিদুর বলল, 'নতুন মন্দিরের সামনে নারানঠাকুরের যে স্ট্যাচু আছে তার সঙ্গে মধুসূদন ভারতীর এই ছবি মেলালে স্পষ্ট বোঝা যায় নারানঠাকুর আর মধুসূদন ভারতী একই ব্যক্তি। যতই চুলদাড়িতে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে ফেলুন, নাক চোখ ঠোঁটের গড়ন তো আর

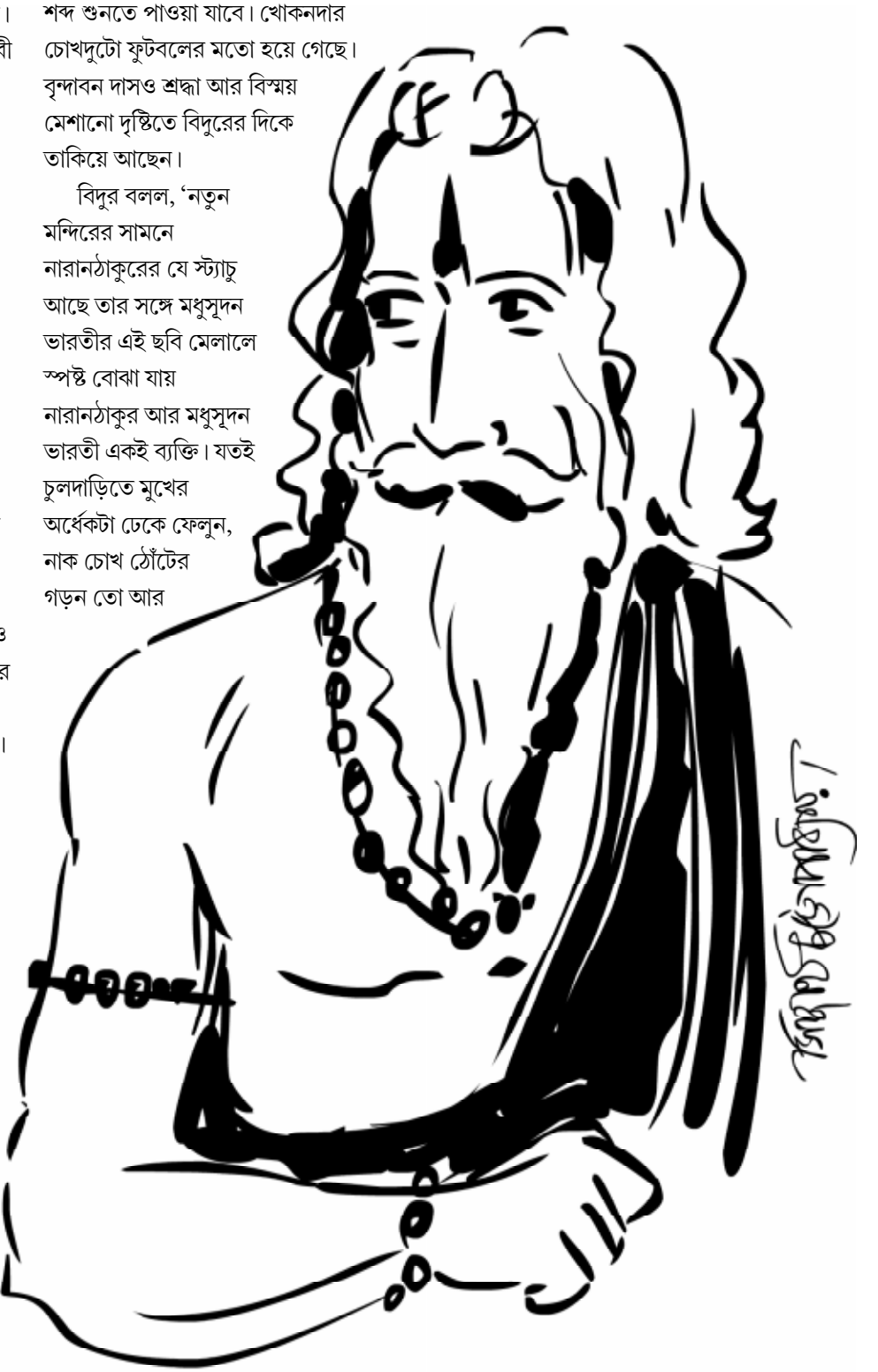

বদলানো যায় না।'

'তুমি শিয়োর, নারানঠাকুর আর মধুসূদন ভারতী একই লোক?' বৃন্দাবন দাস জিজ্ঞাসা করলেন।

'ছবি দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। পরে আপনি যখন ওর পরিচয় দিলেন তখন নিশ্চিন্ত হই। পূর্ব পরিচয় না থাকলে পার্বতীর মতো একজন গ্রাম্য গৃহবধূর পক্ষে মধুসূদন ভারতীর দেখাশোনা করা সম্ভব হতো না। ওর সংস্কারে বাধত। শ্রীমন্ত দাসও ওকে অনুরোধ করতে পারতেন না।

বৃন্দাবন দাস একদম চুপ করে গেলেন। মনে হলো তিনি বোধহয় এই ঘরে নেই। অন্য কোনও জগতে বিচরণ করছেন।

বিদুর বলল, 'আমি জানি আপনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাদের এতদিনের ধারণা আজ ভেঙে গেল।'

'না বিদুর। সেজন্য আমি কষ্ট পাচ্ছি না। তুমি যেভাবে ঘটনাটা সাজিয়েছ তাতে যুক্তি আছে। মানা না-মানা যে যার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা কেন তোমার মতো যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিচার করতে পারলাম না? কেন একটা মনগড়া তত্ত্বে আটকে রইলাম।'

'সেটা বোধহয় আপনারা একটা প্রি ডিটারমাইন্ড কনসেপ্ট নিয়ে বড়ো হয়েছেন বলে। যার বাইরে যাবার স্বাধীনতা আপনাদের দেওয়া হয়নি। আমি বাইরে থেকে এসেছি। তাই খোলা মনে সব দেখতে পেরেছি।'

বৃন্দাবন দাসকে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গঙ্গাধরপুরের রাস্তা এরই মধ্যে বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। কাল চলে যাব। তাই মন্দিরে মাকে দর্শন করার ইচ্ছে হলো। খোকনদাও এক কথায় রাজি।

মন্দিরের আরতি দেখে ফেরার সময় খোকনদা বলল, 'একটা প্রশ্ন আছে বিদুর। গুপ্তধনের কী হলো?'

'সম্ভবত যেখানে ছিল সেখানেই এখনও আছে।'

কৌতূহল সামলাতে না পেরে বললাম, 'কোথায় রে? তুই জানিস?'

'কেন রে! গুপ্তধন খুঁজতে যাবি নাকি?' বলে বিদুর দাঁড়াল। আমরা মন্দির থেকে খানিক দূরে চলে এসেছিলাম। বিদুরের ইশারায় ফিরে গেলাম মন্দিরের কাছে। বিদুর নারানঠাকুরের স্ট্যাচুর সামনে থামল। মন্দিরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ব্রাহ্মণের বলিষ্ঠ প্রতিরূপ। স্ট্যাচুর নীচের বেদীটার দিকে আঙুল তুলে বিদুর বলল, 'এটার বিশাল সাইজ দেখে তোমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, খোকনদা। বিশেষ করে বেদীর তুলনায় স্ট্যাচুটা যেখানে চোখে পড়ার মতো ছোট। অমিত বোধহয় লক্ষ্য করেছিল কিন্তু তলিয়ে ভাবেনি। আমার বিশ্বাস, এই বেদীর ভেতর একটা সিন্ধুক জাতীয় কিছু পাওয়া যাবে। তাতেই আছে তোমার গুপ্তধন। তবে—'

'তবে কী বিদুর?' খোকনদা জিজ্ঞাসা করল।

'ডাকাতি করা ধন খোকনদা। বহু মানুষের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওসব নিয়ে এখন আর না ভাবাই ভালো।'

বিদুর আবার হাঁটতে শুরু করল। আমরা ওকে অনুসরণ করলাম। রাস্তায় আর কোনও কথা হলো না। বিদুরের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে নারান কুটীরে পৌঁছে গেলাম। ▮

With Best Compliments:-

Monoj Kumar Kakra

Krishna Bangles
37, Biplabi Rashbehari Bose Road
2nd floor, Kolkata-1
M : 9831280306